Reg No. C. 653

# আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ ] [ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৭ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

ফরিদপুর।

প্রতি সংখ্যা—৶০।

# সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

# আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল। | ২য় সংখ্যা।

## সাম্য।

( শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন, ফরিদপুর )

সমানীব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো, যথা বঃ সুসহাসতি।

( ঋগ্বেদঃ )

বহির্বিষয়িনী বেগবতী কল্পনায় আদিযুগের মানব মণ্ডলী যখন সুপ্তির অলস স্পর্শে অচেতন প্রায় হইতেছিল, বিস্মৃতি যখন পূর্ণ আবেগে আপনার মহা প্রসারের আবেষ্টনে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যগত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে অন্তর্রাজ্যের উচ্চতম সিংহাসন হইতে নামাইয়া কলুষ কালিমায় কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—যখন ভূমণ্ডলের মানব প্রাণ সমূহ মানবত্বের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে না পাইয়া পশুত্বের পঙ্কিল আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া যাইতেছিল,—এমন সময় অতীতের সেই ঘন ঘটাময়ী পিশাচিনী মূর্ত্তিকে "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" বলিয়া, জড়বাদের সেই অভ্রভেদী বৈজয়ন্তীকে তীব্র উপহাস করিয়া, কামনা-বহ্নি বিক্ষিপ্ত তৃষিত বিশ্ববাসীর অতৃপ্ত হৃদয়ে মধুর উৎস ঢালিয়া দিয়া, ত্রিদিব মর্ত্ত্য বিমোহিত করিয়া ভারতীয় তাপস নিকুঞ্জে একদিন সাধন-পূতঃ ঋষিকণ্ঠ করুণ স্বরে বাজিয়া উঠিল,—

"অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিঃ"

( ঋগ্বেদঃ )

—আমরা সোমপানে অমৃত হইয়াছি, অমৃত জ্যোতি লাভ করিয়াছি, হে অমৃতের পুত্রগণ! এ আলোকে তোমাদেরও স্থান রহিয়াছে। এ যে অনন্ত আনন্দের অনন্ত অমৃত উৎস,—ইহা লাভ করিলে মানব অমৃতময় হইয়া যায়,—আইস,—মহা আনন্দের চিরন্তন অধিকারী হইয়া নিরানন্দে ডুবিয়া রহিও না,—

বরান্নিবোধত। ।

উঠ, জাগ, মহান্ পথের অনুসরণে কৃতার্থ হও।—কাম্যকর্ম্মের ভীষণ কোলাহল মধ্যে সে সাম্যের বীণা সমতার স্বরে,—জিঘাংসা-তাড়িত, ভেদনীতি-পরায়ণ, বর্ত্তমানৈক-সর্ব্বস্ব জড় বিশ্বকে আবার সাদরে আহ্বান করিল। মানব মনীষাকাশে আধ্যাত্মিক গৌরব রবির পরম শুভ প্রাথমিক উন্মেষ লগ্নে পরম কারুণিক সৌম্যমূর্ত্তি বৈদিক ঋষিগণ, ব্যষ্টির গূঢ় হৃদয়-তলস্থ সুপ্তিমগ্ন মহা সমষ্টির লুপ্ত প্রায় চেতনা জাগরিত করিয়া ক্ষুদ্রে মহতে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, জীবে শিবে, জড়ে চৈতন্যে এক অচ্ছেদ্য মধুর একতার মহান্ সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া দিলেন। সে উদাত্ত গভীর রবে ত্রিদিব স্তম্ভিত হইল, সে আশ্বাস বাণীতে তৃষিত মর্ত্ত্য পরিতৃপ্ত হইল,—জড় বিশ্বে চৈতন্যের অনুব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল;—বিশ্বে মানব বুঝিল,—স্বর্গে দেবতা বুঝিলেন,—এ অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণার মঙ্গলময়ী তন্ত্রী কোন অলক্ষ্য শিবময় করে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, কে ইহার পরিচালক?—

ঋগ্বেদের ঋষিগণ গাহিলেন—

সমানীব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো, যথা বঃ সুসহাসতি ॥

হে মনুষ্যগণ! তোমাদের সকলের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয় এক হউক, তোমরা বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও, এ আপাততঃ বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের পূর্ণাভিব্যক্তি দেদীপ্যমান, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণা কর। এই অন্তর্নিহিত বিরাট একত্বই তোমাদের অস্তিত্বের নিয়ামক, ইহাকে বিস্মৃত হইও না,—

বিস্মৃত হইতে পারিবে না,—সুষুপ্তির পর চেতনা ফিরিয়া আসিবেই,—তোমরা ভুলিয়া থাকিলেও এ মহান্ একত্বের সত্তা চির নীরব হইয়া থাকিবে না; সে একদিন একত্বের বিপুল সাম্যরোলে তোমাদের ধ্যান, তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের লক্ষ্য এক করিয়া তুলিবেই। সে দিন তোমাদিগের নিকট পার্থিব জগত নিত্য মধুময় হইয়া উঠিবে, পার্থিব ধুলিকণায় স্বর্গীয় মন্দার রেণুর অনুভূতি পাইবে, তোমরা অবাক্ হইয়া দেখিবে,—অসংখ্য নাম-রূপের সংখ্যাতীত মুকুতারাজি একই নিয়ন্তৃত্ব সূত্রে মালিকার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ একের সহিত অন্যের কিছুমাত্রও মৌলিক বিভিন্নতা নাই—তরঙ্গ ফেন ও বীচিমালা যেমন জলেরই স্বরূপ, উহাদের উৎপত্তিতে, অবস্থানে, বিলয়ে, আদি, মধ্য ও অন্তে জলই যেমন একমাত্র সত্তা, জল ভিন্ন যেমন উহাদের কল্পনাও অসম্ভব,—তেমনি অসীম একত্ব, বিরাট চৈতন্য এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি মধ্য ও অন্তে,—প্রকাশের, অবস্থানের ও বিলয়ের অসংখ্য নাম-রূপ বুকে লইয়া অনাদি আবহমান কাল একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

হে মানব! তোমার এই অন্তস্তল-শায়িত শাশ্বত পরদেবতাকে চিনিতে চেষ্টা কর, ইহারই শরণাপন্ন হও, ইহাকেই দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে প্রয়াস পাও; বিশ্ব তোমার আপন হইয়া উঠিবে, বিভীষিকাময়ী ভেদনীতি, বিক্ষিপ্ত চিত্তভূমে আর বহুত্বের ক্ষুদ্রবীজ বপন করিতে পারিবে না। যতদিন ইহাকে চিনিতে না পারিবে—তত দিন, তত কাল, তত যুগ তোমার কেহই আপন হইবে না, তত দিন জগতের আপন, জগদীশ্বরের আপন হইয়াও হে আত্মবান্! তুমি অতৃপ্ত বাসনা-স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত অকুল সাগরে ভাসিয়া বেড়াইবে, কিছুতেই কুল পাইবে না; তুমি নিজের নিকট, বিশ্বের নিকট, বিশ্বের দেবতার নিকট দিন দিন পর হইয়া যাইবে। ঐ শুন, অন্তস্তল-বাহিনী মন্দাকিনীর কল কল ধ্বনি তোমার শ্রবণ পথে কি এক মধুর বার্ত্তা আনয়ন করিতেছে; তুমি বিস্মৃত হইয়াছ, তাই বুঝিতে পারিতেছ না, এ শ্রবণ-মধুর ললিত গলিত রব যে তোমারই স্বভাব-গীতি ভাই!! এ স্বাগত অনাহত বংশী ধ্বনি অনাদিকাল জীব হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে চৈতন্যের মূর্ত্তিমতী মূর্চ্ছনা জাগরিত করিয়া দিতেছে, এ স্বর পরিকম্পন অন্তর্রাজ্যে বিপুল পুলক-স্পন্দন জাগাইয়া আবার অন্তরেই মিশিয়া যাইতেছে। হে মানব! তোমার বিষয়-বিমূঢ় লৌহময় হৃদয়-দ্বারে

বার বার তাহার শুভাগমন ব্যর্থ হইয়া গেল, তবুও তাহার বিরাম নাই,—সহস্র বার উপেক্ষিত হইয়াও সে আবার আসিয়া বলিতেছে,—

প্রকাশ রূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দ ময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥

আমি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, জন্মাদিরহিত, অদ্বিতীয় প্রকাশমান, অতীব নির্ম্মল, নিরাময়, বিজ্ঞানময়, সম্পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ।

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবঽহং ॥

—আমার দ্বেষ নাই, রাগ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মাৎসর্য্য নাই, ধর্ম্ম নাই, অর্থ নাই, মোক্ষ নাই, অর্থাৎ—এ সমস্তের সহিত আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, আমি একমাত্র-মঙ্গলময় শিব-স্বরূপ। কোন্ দুর্ভেদ্য আবরণে, হে মানব! তোমার এই সুখময় স্বরূপ আবরিত হইয়া গেল? কে তোমার একত্বের সার্ব্বভৌমিক শাশ্বত ক্ষেত্রে বহুত্বের বিষময় বীজ রোপন করিয়া স্বর্গীয় নন্দন-কাননকে নরকের পূতিগন্ধময় অন্ধ-তমসাবৃত লৌহ-গহ্বরে পরিণত করিয়া দিল?—তাহা একবার অনুসন্ধান কর। বৈদিক ঋষিগণের এ সাদর-সম্ভাষণ প্রাচীনতম যুগের মানব-প্রাণ উপেক্ষা করিতে পারিল না;—ধ্রুব সত্যের অমোঘ স্পন্দন বিরাট বিশ্বের হৃদয়-তলিনস্থ প্রসুপ্ত মহাসত্যের এক শুভময় উন্মুখাবস্থা আনিয়া দিল। বিবর্ত্তনের অনুকূল বায়ু জ্ঞানময় মহাব্যোমে বিশ্ব-হিতে স্পন্দিত হইয়া ধীরে ধীরে ব্যষ্টিকেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িল, প্রকৃতির ক্রোড়গত অলস-নিদ্রা-লোলিত বিচেতন মানব-চিত্তে প্রাথমিক পৌরুষেয়-বোধ প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিল। উচ্চ কল্পনার নবীন উন্মেষে মানব বুঝিল,—যে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে অনন্ত

বিশ্রাম সুদূর-পরাহত। প্রতি আধারের হৃদয়-দেশে বিরাট মুক্ত চৈতন্যের গূঢ় আবাস নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। চৈতন্য-নিরপেক্ষ এ আধারগুলির কোনই সত্ত্বা নাই। জড় সংস্পর্শে জীব তাহার স্বত্ত-চৈতন্যের সার্ব্বভৌমিকত্ব যতই বিস্মৃত হয়—ততই তাহার উপর জড়ীয় প্রভাব আপন প্রসারতা বিস্তার করিতে থাকে। বিকার-গ্রস্থ রোগীর মত স্বভাব-প্রচ্যুত জীব তখন ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে প্রাকৃতিক গুণানুপ্রেরণায় আত্মোপলব্ধিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া পড়ে, এই বশীভবনই যাবতীয় দুঃখের কারণ।

ঋষি হৃদয় আগত স্বচ্ছ জ্ঞানালোকে বিশ্বমানব একথা বুঝিতে পারিল। তাহারা প্রতি হৃদয় নিহিত জীব; চৈতন্যের একত্ব ও অমৃতত্ব অবগত হইয়া যুক্তকরে সমস্বরে গাহিল—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান! অমৃত-লোকে॥

৯। ১১৩। ৭

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদঃ আসতে
যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মামমৃতং কৃধি—

৯।১১৩।১১
(ঋগ্‌বেদঃ)

"যে লোকে অজস্র জ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃত লোকে আমাকে লইয়া চল।"

"যে লোকে মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ অবস্থান করে, যে লোকে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া যায়, সেই অমৃত লোকে আমাকে অমর কর।"

মানব চিন্তা যতই উচ্চ স্তরে উঠিতে লাগিল ততই তাহারা সংশয়শূন্য জ্ঞাননেত্রে দেখিল—

হংস শুচি সৎ বসু অন্তরীক্ষ সৎ
হোতা বেদি সৎ অতিথির্দুরোন সৎ

নৃ ষৎ বর সৎ ঋত সৎ ব্যোম সৎ
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্

হংসবতী ঋক্ ।

সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি—ইহারা এক ঋত ( ব্রহ্মসত্তা ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আবার এই ঋত সত্তাই "নৃষৎ" অর্থাৎ—মানবহৃদয়ে জীব, চৈতন্যরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলের গূঢ়তম প্রদেশে, ব্রহ্মযজ্ঞের অগ্নিমধ্যে, গতিশীল বায়ুর অন্তরে, এই ঋত সত্যই সত্তারূপে বিরাজমান ; এই ব্রহ্মসত্তাই সমুদ্রে অগ্নিরূপে, উদয়াচলে সূর্য্যরূপে, আবার ইনিই শশী সূর্য্যের কিরণরূপেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন ; এই ঋত ( ব্রহ্ম সত্তাই) একমাত্র মহাসত্য, ইনিই বিশ্বের অধিষ্ঠান ভূমি।

সূক্ষ্মান্তর্দ্দৃষ্টির গভীর গবেষণা আদিযুগের মানব মণ্ডলীকে এই ভাবে বিরাট একতার দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করিয়া দিল। চিরন্তন সত্যের "একমেবা-দ্বিতীয়ং" বিজয়গৌরবে বহুত্বের অবসান হইয়া গেল, একত্বের অসীম বিস্তারের মধ্যে ক্ষুদ্রত্ব লাজে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল। "বসুধৈব কুটুম্বকং" প্রেমের আলিঙ্গনে ভেদনীতি মূলক হিংসা দ্বেষের অবসান হইল, স্বভাবস্থ মানব বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল—"অবাঙ্ মনসাতীত" অচ্ছেদ্য, অদৃশ্য তাহার সুখময় স্বরূপ কি মধুর ! সে আরও দেখিল, তাহারই অন্তঃসত্তা—গ্রহ নক্ষত্রের অভ্যন্তরে, হিমানীর শীতবক্ষে, শ্যামলা ধরিত্রীর হরিৎ তৃণরাজি পরিকম্পিত পুলোকোচ্ছাসে, অভ্রভেদী হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে, মহাসাগরের প্রশান্ত উদার বক্ষে, মুকুলোদ্গম পল্লব পরিকম্পনশীল বসন্তানিলে—সুকৌশলে আপন আবাস রচনা করিয়া লইয়াছে।

এক এব ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

এক আত্মাই সর্ব্বভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন, যেমন এক চন্দ্রই চঞ্চল জলমধ্যে বহু চন্দ্র বলিয়া মনে হয়—সেইরূপ এক আত্মাই প্রতি দেহাধারে পৃথক পৃথক দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ—ইত্যাদি

( শ্রুতিঃ )

এই আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য,—ইনিই একমাত্র শ্রোতব্য, ইনিই একমাত্র অন্বেষণীয়,—

অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব
দুঃখিত্বাদি সংসার সম্ভাবনাপি ভবতি
যথা স্বাজ্ঞানে নাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্ব সম্ভাবনা ।

( বেদান্তঃ )

জ্ঞাতব্য বস্তু অজ্ঞানে আবৃত হইলে তাহাতে কোন এক বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হইবেই ; অজ্ঞানাবৃত রজ্জুতে যেমন সর্পরূপ কল্পিত দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত আত্মাতেও সুখিত্ব দুঃখিত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কল্পিত ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে।

অজ্ঞানন্তু, সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞান বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি

( বেদান্তঃ )

অজ্ঞান একপ্রকার জ্ঞাননাশ্য অনির্ব্বচনীয় পদার্থ ; ইহা ভাব ও অভাব দুয়েরই বহির্ভূত, ও ত্রিগুণাত্মক, এই অজ্ঞানই যাবতীয় দুঃখের জনক।

যয়ামাং মোহিতো জীবঃ
আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোপি সমুত্তে স্ব নর্থং
তৎকৃতং চ অভিপদ্যতে

( উপনিষৎ )

জীব স্বয়ং চিরমুক্ত হইলেও এই মায়ায় মোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে এবং মায়ার ত্রিগুণাত্মক ধর্ম্ম সংস্পর্শে আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদি মনে করিয়া অশেষ দুঃখ পাইতে থাকে।

নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তা দাবর্ত্তাস্তরমাশুতে
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃত্তিম্।
(বেদান্তঃ)

যেমন নদীর আবর্ত্তেপতিত কীট সকল এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়, কোন রূপেই উত্তীর্ণ হইয়া সুখ লাভ করিতে পারে না,—সেইরূপ অজ্ঞান বিমূঢ় জীব কাম্য কর্ম্মের প্রবল প্রবাহে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রনাই পাইতে থাকে, বিশ্রাম সুখ তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে না।

যতদিন জীব তাহার একত্ব ও নির্ম্মুক্ত স্বরূপ অবগত হইতে না পারিবে ততদিন ক্ষুদ্রত্বের পসরা লইয়া অজ্ঞান নিয়মিত প্রহেলিকাময় দীর্ঘ কুটিল পথে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেই হইবে।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃত্তিম্

জন্ম জন্ম এই দুঃখের গতায়তিতেই কাটিয়া যাইবে, শান্তি নিকটে আসিতে পারিবে না।

আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামাঃ য়ং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম কামী। (গীতা)

অনন্ত অচল স্থির সমুদ্রের সনে
জলরাশি ধীরে ধীরে মিশিছে যেমন—
তেমতি অনন্ত আত্মা, স্থির অবিচল;
কামনা বাসনা যার—তাহাতে বিলয়,
সেইমাত্র লভে 'শান্তি'—কামী নাহি পায়।

যে আপন মহান্ সত্তা অবগত হইতে পারে নাই, তাহার হৃদয় সাম্যের স্বচ্ছ বিমল আলোকে আলেকিত হয় নাই,—তাহার পক্ষে এ শাশ্বতী শান্তির সুখময়ী আশা নিশার স্বপ্ন মাত্র। সাম্যের দেবতা ধ্রুব সত্য বেদবাণীর অভ্যন্তরে, উপনিষদের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী দুগ্ধ-ধারায়, দর্শনের সুস্পষ্ট জ্ঞানালোকে, তন্ত্রের

মাঠ-মধ্যে, গোপীকুল-বিমোহন বংশী-নিনাদে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর প্রতি কূলে কূলে আবেশ-আকুল ঊর্দ্ধ ভুজ যুগে, আরবের উত্তপ্ত মরুভূমে, হিমানীর শীত শুভ্র বক্ষাসনে, যুগে যুগে একই একত্বের মহান্ উন্মেষ জাগাইয়া, জড়ে চৈতন্যে, জীবে জীবে, মহতে ক্ষুদ্রে, সর্ব্বত্র "সাম্যের" বেদীকায় মৈত্রীর সুখাসন পাতিয়া গিয়াছেন।

আবার বিধাতার এই উদ্বোধন-ক্রিয়া লোক-লোচনের অদৃশ্যে— 'কৃতিত্ব' অস্তিত্বে"র পরিচায়করূপে নীরব প্রকৃতির অনুকূলে নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে, মানব তাহা বুঝিতেও পারিতেছে না,—সেথায় কার্য্য আছে, কোলাহল নাই। বিশ্ব-হিতে মহাত্যাগের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু যজ্ঞের কৃষ্ণ ধূমে অনন্ত আকাশের অনন্ত নীলিমা আচ্ছাদিত হয় নাই, যজ্ঞাগ্নিতে সহস্র ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু সে পূত ব্রহ্মাগ্নি স্থির, অবিচল, প্রশান্ত,—বিন্দুমাত্রও ধূম উদ্গীরণ করিতেছে না। মানব! সহায় খুঁজিতেছ, সহায় পাইবে,—নিঃস্ব হইয়াও, পাথেয় পাইবে,—এ মূর্ত্ত পবিত্রতার অনুসরণ কর। সে আশীর্ব্বাদ— সে অযাচিত করুণা, সে বিগলিত কারুণ্যের নিয়ত প্রবাহিত অশ্রুধারা জগতের প্রতি ধূলি-কণায়, বনান্তরাল-মিলন-লোলুপ নির্ঝরের প্রতি আকুল মিলন-স্পন্দনে, জীব-হৃদয়ের প্রতি নিভৃত প্রদেশে, অনন্ত ব্যোমের অনন্ত সত্তায়, বাতাসের স্পর্শে, আলোকের রূপাভিব্যঞ্জনায়, শৈত্যের শীত-কণায়, কাঠিন্যের কঠিনতায়,—নিত্য বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

যুগাবতারগণের অবতরণ ব্যর্থ হইবার নহে, তাঁহাদের সে মধুর আকুল আহ্বান আজও জীবের শ্রবণ-পথে ধ্বনিত হইতেছে। তাই ভরসা,—মানব, জড়বাদের অন্তরালে, বৈষম্যের উচ্চ কোলাহলে যতই আত্মবিস্মৃত থাকুক, তাহার অন্তস্তল-শায়িত বিরাট সত্তা আবার এক শুভ লগ্নে জাগরিত হইয়া তাহাকে 'সাম্যের' পথে, বিশ্ব ও বিশ্ব-দেবতার সহিত এক করিয়া দিবে।

সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

ঋগ্বেদ

---

# প্রতীক্ষায়।

( শ্রীহৃদয়গোপাল বসুবর্ম্মা, কলিকাতা )।

১

নিস্তব্ধ রজনী; তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কুসুমপুর পল্লী সুপ্ত। বন্য-কুসুম-বাস-সুরভিত, ঝিল্লী-রব-মুখরিত, রজত-শুভ্র-সৌদামিনী-কিরণে অলঙ্কৃত পল্লী-বক্ষে, নৈশ সমীরণ মৃদু হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছিল। বিরহ-পীড়নে বিগতনিদ্র কোন পাপিয়া বৃক্ষ-শিরে সপ্তম স্বরে বিষাদ-লহরী তুলিয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় নিশীথ গগণকে বেদনাপ্লুত করিতেছিল।

এমন সময় "রায়দের ঘাটে" একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। পরেশ রায় কুসুমপুরের ধনাঢ্য জমিদার। তাঁহারই অনুমতিক্রমে তাঁহার বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাট বাঁধান হইয়াছিল বলিয়া এই ঘাটকে "রায়দের ঘাট" বলে। ঘাটে নৌকা লাগিলে, দুই জন লোক তীরে অবতরণ করিলেন। এক জন আমাদের পরিচিত পরেশ রায় ও অপরে—জনৈক ডাক্তার। রায়-গৃহিণী মাসাধিক কাল রোগ-শয্যায় শায়িতা। আজ ৩। ৪ দিন তাঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ; তাই পরেশ রায় নিজেই কুসুমপুরের নিকটবর্ত্তী 'ফুলবেড়িয়া' ষ্টেসনে ডাক্তার আনিতে গিয়াছিলেন।—ডাক্তার পরেশ রায়ের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। নিশীথ-নিস্তব্ধ পল্লী-পথ দিয়া তাঁহারা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্বচিৎ কোন গৃহপালিত কুকুর তাঁহাদের সাড়া পাইয়া সন্ত্রস্তভাবে দুই এক বার ডাকিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল।

সদর দরজা বন্ধ ছিল, চীৎকার করিয়া পরেশ রায় ডাকিলেন—"অনু"। নৈশ সমীরণে সে মধুর আহ্বান সমস্ত বাড়ীটিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অনুপমা পরেশ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা—বাল-বিধবা। বাটীর মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল; সকলেই উৎকণ্ঠিত ভাবে পরেশ রায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দশম বর্ষীয় বালক ভবেশ তখন জাগরিত ছিল; সে পরেশ বাবুর একমাত্র পুত্র। অনুপমা ভবেশ অপেক্ষা ৬ বৎসরের বড়

রবেশ পার্শ্বস্থ অর্দ্ধ শায়িতা অনুপমাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—"ও দিদি! বা এসেছেন বোধ হয়।'—সেই সময় পরেশ বাবু আবার ডাকিলেন—'অনু'! হার গলার সাড়া পাইয়া একজন ভৃত্য সদর দরজা খুলিয়া দিল। অনুপমা ভবেশ ইতিমধ্যে একতলা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল। পরেশ বাবু হাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অনু! তোমার মা এখন কেমন ছেন?'

'সমস্ত সন্ধ্যে রাতটা কেবল 'পেটে ব্যথা' বলে চীৎকার করেছেন—এই কটু আগে ঘুমিয়েছেন।'

"তবে এখন থাক, উঠ্‌লে—ব'ল। চলুন ডাক্তার বাবু, বাইরের ঘরে বসি য়ে।"—এই বলিয়া পরেশ বাবু ডাক্তারের সঙ্গে নীচে আসিতেছেন, এমন য় অনুপমা ডাকিয়া বলিল—"বাবা! মা জেগেছেন, আসুন!"—পরেশ বাবু ডাক্তার বাবু আবার উপরে আসিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া রায়-গৃহিণী একটু সন্ত্রস্তভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; অনুপমা তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। পরেশবাবু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম দেখলেন, ডাক্তার বাবু?" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বাবু উত্তর করিলেন—"নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপে তেল দিলে আর ফল কি, পরেশ বাবু!"—তারপর উভয়ের মধ্যে অসুখের বিষয় নানাপ্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার বাবু ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—৪টা বাজে। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরেশ বাবু একবার উপরে গিয়াছিলেন—সহসা নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবু! শীঘ্র আসুন ত!—রোগী যেন কেমন ক'রছে!" ডাক্তার বাবু ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—শ্বাস উঠিয়াছে। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বালক ভবেশও বুঝিতে পারিল তাহার মাতার কিছু হইয়াছে। সে—"মা!—মা!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল ও বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল;—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! অনুপমা কাঁদিয়া উঠিল—"মাগো! তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে গো!"—পরেশ রায় বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া

রহিলেন। চক্ষের পলকটী পর্য্যন্ত পড়িল না।" ডাক্তার বাবু রুমালে চোখ মুছিলেন।

## ২

রায় পরিবারের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর, প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভবেশ এখন কলিকাতায় থাকিয়া কোন একটী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সংসারের ভার আজকাল অনুপমার উপর। অনুপমাও তাহার পিতার সহিত ভবেশকে লইয়া কলিকাতায় থাকে। জমিদারীর ভার তাহার বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্যামলনাথের উপর অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ পরেশ রায় পুত্র-কন্যা সহ কলিকাতাতেই থাকিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার ঠিক পাশের বাড়ীতেই ভবেশের সহপাঠী জিতেন থাকিত। ভবেশ তাহার স্নেহময়ী ভগ্নী অনুপমা ও বন্ধু জিতেনকে পাইয়া মাতৃশোক অনেকটা ভুলিয়াছিল। জিতেন ভবেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই অকপট বন্ধুত্ব দেখিয়া উভয়ের পিতা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। জিতেনও তাহার পিতার একমাত্র সন্তান, তাই অনুপমাকে পাইয়া জিতেন তাহার ভগ্নীর অভাবটী পূর্ণ করিয়া লইল। অনুপমাও তাহাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

ভবেশের ও জিতেনের ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষা শেষ হইয়াছে; উভয়েই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে দেখিয়া তাহাদের পিতা পরম আনন্দিত হইয়াছেন।—একদিন অনুপমা বসিয়া পান সাজিতে ছিল, ভবেশ ও জিতেন অদূরে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল—সহসা জিতেন উঠিয়া অনুপমার কাছে গিয়া বলিল—"দিদি! একটা কথা বল্‌বো?"—বলিয়া একটী পানের বোঁটা দিয়া মেজেতে দাগ কাটিতে লাগিল। ভবেশও উঠিয়া আসিয়া সেইখানে বসিল। অনুপমা একটী পানের খিলি মুড়িতে মুড়িতে বলিল—"কি কথা জিতেন, বল? আমার কাছে তুমি লজ্জা ক'রবে,—না, ভয় ক'রবে?" "না, তা নয়,—বলছিলেম কি"—জিতেন ভবেশের মুখের দিকে একবার তাকাইল—তার পর বলিল—"বলছিলেম কি,—ভবেশের একটা বিয়ে'—কথাটী শেষ হইতে না হইতেই ভবেশ জিতেনকে

একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—'না, না, দিদি? তুমি জিতেনের কথা শুনে কাজ ক'র না'—এমন সময় বৃদ্ধ পরেশ রায় সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন; ভবেশ ও জিতেন উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। অনুপমা বলিল—'বাবা একটা কথা শুনবেন?' পরেশ বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—'তোমার কোন্ কথা কবে শুনি নাই মা,—যে আজ এত সঙ্কুচিত হয়ে ব'লছো?'—অনুপমা আবদারপূর্ণ দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাইয়া বলিল—'ভবেশের একটা বিয়ে দিলে না—বাবা! আমি একলা থাকি—তবু বৌ এ'লে একটা সঙ্গী পাব।'—পরেশ বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলুম আর কিছুদিন পরে দেবো। তা তুমি যখন বলছো, তখন দেখি।'—এই বলিয়া পরেশ বাবু চলিয়া গেলেন। অনুপমাও কার্য্যান্তরে গেল।

* * *

প্রায় এক বৎসর পরে যখন এক দিন সন্ধ্যার সময় ভবেশ একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার হাত ধরিয়া ঘরে আসিল, তখন অনুপমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আর আনন্দের প্রবাহ ছুটিল,—বৃদ্ধ পরেশ রায়ের জীর্ণ হাড় কয়খানির ভিতর। বৃদ্ধ তাঁহার বালিকা পুত্রবধূকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নববধূর নাম—করবু। দীর্ঘ রাত্রিটী যে কি স্নিগ্ধ আনন্দে কাটিয়া গেল, তাহা কেহ টেরও পাইল না। বৃদ্ধও সমস্ত রাত্রি ঘুমান নাই।

## ৩

গ্রীষ্মের ছুটী হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ রায় মহাশয় প্রতি বৎসরই এই সময় দেশে যান, এবার পুত্র-বধূ সহ দেশে আসিলেন। ভবেশ কিন্তু জিতেনকে সঙ্গে লইতে ভুলিল না। রূপে-গুণে সাবিত্রী-সদৃশ। পুত্রবধূ দেখিয়া কুসুমপুরের সকলেই বৃদ্ধ পরেশ রায়কে 'বাহবা' দিতে লাগিল। এই হুজুকে ভবেশকেও তাহার বন্ধু-মহলে একটু লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। ঘোষেদের বাড়ীর স্বরেন একদিন ঠাট্টার ছলে ভবেশকে বলিল—"হ্যাঁরে ভবা! এমন ডানা-কাটা পরীটী কোথায় পেলি ভাই? কলিকাতায় যে এমন সমস্ত ডানা-কাটা পরী

পাওয়া যায়—তাত যান্তেম না”—এই প্রকারের বিদ্রূপে ভবেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

* * * * *

সে দিন ভবেশের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না—কেন যে এরূপ হইল তাহা সে কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; নীল গগণে রক্তিমচ্ছটা ফুটাইয়া দিগন্তে বিষাদের ছবি আঁকিয়া তপন দেব অস্তাচলে চলিয়াছেন। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভাটুকু দূরস্থ বৃক্ষরাজির সবুজ পত্রাচ্ছাদিত শীর্ষদেশে ক্ষণকাল বিশ্রামলাভের জন্য বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

এমন সময় কুসুমপুরের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জলরাশি বিক্ষুব্ধ করিয়া পাল-ভরে তর্‌তর্ বেগে একখানি তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে; নৌকায় ভবেশ ও জিতেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভবেশ গাহিল—

“জগৎ দেখ না চেয়ে যাচ্ছি বেগে প্রাণের তরণী”—

—জিতেন মুগ্ধনেত্রে পলকহীন দৃষ্টিতে ভবেশের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সহসা ভবেশ গান থামাইয়া জিতেনের গলাটী জড়াইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—“জিতু! তুই আমায় চিরকাল এমনি ভায়ের মত ভালবাস্‌বি? আমার ভাই, মা নেই—” ভবেশ আর বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। জিতেনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সেও ত দশবৎসর মাতৃহারা! মা-হারা দুইটী হৃদয়ের সংযমের বাঁধ আজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। কতক্ষণ পরে জিতেন বলিল—“ভবেশ—কাঁদিস্‌নি ভাই! মা ত কারও চিরকাল থাকে না। সংসারে সবই এই রকম! তবে আর ভেবে লাভ কি ভাই? চল্ বাড়ী যাই। দিদি হয়তো ভাবছেন।” যখন ঘাটে নৌকা লাগাইয়া উভয়ে তীরে অবতরণ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দুইজনে গৃহাভিমুখে চলিল।

বাড়ী আসিতেই অনুপমা বলিল—“ভবেশ একটী বার এদিকে আয় তো। সরযুর বোধ হয় জ্বর হয়েছে; আর বলছে, বগলটাতে নাকি ব্যথা হয়েছে।”—ভবেশ আসিয়া দেখিল, সরযু বিছানায় শুইয়া আছে, গায়ে হাত দিয়া দেখিল একটু জ্বরও হইয়াছে। সে আর কোন কথা না বলিয়া জিতেনের সঙ্গে পিতার সহিত দেখা করিতে ‘গদী’তে গেল। পরেশ বাবু সব শুনিয়া

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তাইতো! আমার বড় ভয় হচ্ছে—তোমরা একবার 'ফুলবেড়ে' যাও; ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।"—ভবেশ ও জিতেন ডাক্তার আনিতে চলিয়া গেল। পরেশ বাবু বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

তখন সবে মাত্র উষার আলোক প্রকাশ পাইতেছে। কুসুমপুরের নদীর তীরে তীরে পথ,—সেই পথ দিয়া ভবেশ ও জিতেন ডাক্তারের সহিত আসিতেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস, নদীতে সামান্য জল, আর দুই পার্শ্বে বিস্তর বালির চর, মধ্যে এক গাছি রজত সূত্রের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী তটিনী বহিয়া চলিয়াছে। অপর পার হইতে ভোর বেলার ঝুরঝুরে বাতাসটুকু বনফুলের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। ভবেশের হৃদয় বিষাদ-কম্পিত!

যখন ভবেশ ডাক্তার লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি, প্লেগ হয়েছে।"—'প্লেগ হয়েছে'—কথাগুলিতে যেন পরেশ রায়ের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি ছিঁড়িয়া গেল। তিনি ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া বহির্বাটীতে গেলেন। ভবেশ ও জিতেন রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত হইল। একা অনুপমা কত দিক সাম্‌লাইবে? বাধ্য হইয়াই তাহাকে গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইল। সরযূ কখনও জিতেনের সঙ্গে কথা বলে নাই—তবে তাহার সম্মুখে বাহির হইত। উভয়ে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছে, এমন সময় পরেশ বাবু গৃহান্তর হইতে ডাকিলেন 'ভবেশ!'—ভবেশ জিতেনকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল। ভবেশ চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে, সরযূ একবার চারিদিকে তাকাইল যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। জিতেন বলিল—"বৌদি! কা'কে খুঁজছেন? দিদিকে ডেকে দোবো?"—সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া সরযূ পাশ ফিরিয়া শুইল। জিতেন উঠিয়া যাইতেছিল এমন সময় ভবেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যাচ্ছিস্ জিতেন?'—'দিদিকে ডাক্‌তে—'বলিয়া জিতেন চলিয়া গেল। অনুপমা আসিয়া দেখিল, শ্বাসের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ভবেশ কাঠের পুতুলের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় ডাক্তার ও পরেশ বাবু আসিলেন। বহু চেষ্টায় কোনই ফল হইল না। রোগিনী অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

তখন সরযূ একবার ভবেশের দিকে তাকাইয়া কি বলিল। কেহ বুঝিতে পারিল না। কেবল ভবেশ খুব নিকটে ছিল বলিয়া, সে শুনিল—"প্র-তী-ক্ষা-য়।"—তার পর সব শেষ! ভবেশ শুনিতে পাইল যেন কেবল—'প্র-তী-ক্ষা-য়' কথাটী চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বৃদ্ধ পরেশ বাবু শোকের উপর শোক পাইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

## ৪

ব্যথিত-বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ভবেশ আবার কলিকাতায় ফিরিল। কিন্তু কলিকাতার সেই বাড়ীটী সকলের কাছেই জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ পরেশ রায় এখন জীবন্মৃত অবস্থায়, তাঁহার গৃহ-লক্ষ্মী আজ নাই। ভবেশ প্রথম প্রথম একটু উন্মনা হইল! তাহার নীরব বক্ষ হইতে এক একটী তপ্ত গভীর শ্বাস তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যে বাধা দিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় ভবেশ একাকী গঙ্গার তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে ধীরে ধীরে শ্মশান-তটে আসিয়া পড়িল। শ্মশান-তট ধৌত করিয়া পুণ্য-সলিলা গঙ্গা নীরবে বহিয়া যাইতেছেন। শূন্য বায়ু সন্ সন্ করিয়া চলিয়াছে। তখন তাহার মনে হইল,—"সরযূ-হীন জগতে থাকিয়া লাভ কি? সে সংসার ত্যাগ করিয়া গেল,—আমরা কি পারি না? ঐ যে জলরাশি, উহার তলায় শয়ন করিলে কি সকল জ্বালার অবসান হয় না? আত্মহত্যার পাতক হইবে? পাপ! পাপ কি? পাপে জ্বালা? এ জ্বালার চেয়ে সে জ্বালা কি বেশী? ভগবান্! তুমি না মঙ্গলময়?—তবে তোমার রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন? সরযূকে হারাইলাম কেন?"—সে কথার উত্তর আসিল। কোথা হইতে কে যেন মেঘ-মন্দ্র স্বরে বলিয়া উঠিল—"এই ধ্বংসনীতি নিষ্ঠুরতার কারণ নহে! সংসারে দয়া জাগিয়া উঠে—হাহাকার ছুটিয়া চলে। ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হয় না।"—ভবেশ কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমার প্রাণের তার ছিন্ন করিয়া, আমার স্বরভরা বীণা ভাঙ্গিয়া কি লাভ হইল?"

উত্তর আসিল—"তুমি আমি কেন গো? জড়ে ও অজড়ে সর্ব্বত্র সমান বিধি! শোক কেন? কে আসে, কে যায়? ভ্রান্তি,—সব ভুলিয়া যাও।"

"কাহাকে ?"—সহসা তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়া কে যেন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—'ভবেশ্!' চমকিত হইয়া ভবেশ দেখিল—জিতেন ; তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ।

* * * * * * *

ভবেশ ও জিতেনের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। উভয়েই পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছে। ভবেশ আর সরযূর কথা বড় একটা ভাবিবার সময় পায় না। জিতেন আজ কাল ভবেশের কাছে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়ে ও উভয়ে এক স্থানেই শয়ন করে।

সে দিন শুক্ল পক্ষের শুভ্র রজনী। বাহিরে ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না। অনেকক্ষণ পাঠের পর ক্লান্তি বশতঃ জিতেন পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় ১টা বাজে। সে উঠিয়া দাঁড়াইতে ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাচ্ছিস্ ?'

'কোমরটা বড্ড ধরেছে—একটু ঘুরে বেড়াই'—এই বলিয়া জিতেন কক্ষ সংলগ্ন উন্মুক্ত ছাদে আসিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল, কিছুক্ষণের পর সে কক্ষাভিমুখে ফিরিল। সহসা তাহার দৃষ্টি সেই কক্ষের ছাদের উপর পড়িল। জিতেন থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি। জিতেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে আবার ভাল করিয়া চাহিল। দৃষ্টি ভ্রম মনে করিয়া জিতেন আবার সেই দিকে তাকাইল। সে এইবার ভীত হইল, দেখিল,—যে গৃহে বসিয়া ভবেশ পড়িতেছে, সেই ঘরের ছাদের কার্ণিসের উপর, ঠিক সরযূর মতন কে যেন পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে ও নত হইয়া ভবেশের পাঠ আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে। নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় জিতেন দেখিল,—সরযূই বটে। তাহার বাক্-শক্তি রহিত হইল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে সে ডাকিল—'ভবেশ!' সে স্বর অতি ভীতিব্যঞ্জক, অতি বিকট। ভবেশ তাহার স্বর শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিল। সে দেখিল, জিতেন স্থির দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছে ; তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া, তাহার কাপড় বাধিয়া চেয়ারখানি পড়িয়া গেল। সেই শব্দে জিতেন সেই দিকে চাহিল, পুনরায় ছাদের দিকে তাকাইয়া কিন্তু কিছুতেই দেখিতে পাইল না ; তখন ভবেশকে সকল কথা বলিতে বলিতে

ঘরে আসিয়া বসিল। কিন্তু তৎপর দিবস হইতে কেহই কিছু দেখিতে পাইল না। ইতিমধ্যে পরীক্ষা আসিয়া পড়ায় কাহারও এ বিষয় আর কিছু মনেও পাড়ল না। পরেশ বাবু ও অনুপমার নিকট কিন্তু এ বিষয় অজ্ঞাত রহিল।

৫

এই ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে বৎসর বন্যা হওয়ায় পল্লী গ্রামের অনেক স্থানে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বৃদ্ধ রায় মহাশয় একদিন তাহার বিশ্বস্ত দেওয়ানের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলেন যে, বন্যায় তাঁহাদের বাড়ী-ঘরে জল উঠিয়া বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং তাঁহাদের একবার বাড়ী যাওয়া দরকার।—তিনি পত্রখানি পড়িয়া অনুপমাকে দেখাইলেন ও শীঘ্রই তাঁহার বাড়ী যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, এ কথাও বলিলেন। অনুপমা বলিল—'তা কি হয়? আপনি বুড় মানুষ, একা কখনই যাওয়া উচিত নয়। ভবেশেরও ত বি, এ, পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলেই যাই চলুন। অনেক দিন ত বাড়ী যাই না।'—প্রস্তাব সঙ্গত বিবেচনা করিয়া পরেশ বাবু দেওয়ানকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, সকলের যাওয়াই স্থির হইল। ভবেশ জিতেনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিত না, তাই জিতেনকেও যাইতে হইল; কিন্তু বৃদ্ধের অলক্ষ্যে তাঁহার বুকখানা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

বাড়ীতে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, বন্যার জল অপসারিত হইয়াছে কর্ত্তব্য-পরায়ণ শ্যামলনাথও বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য খুবই ব্যস্ত। বহু কাল পরে প্রাচীন পরেশ বাবুকে পাইয়া কুসুমপুর যেন সজীব হইয়া উঠিল; আবার পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বহির্বাটীতে জন-সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু পরেশ রায় আর সে পরেশ রায় নাই; এই অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একটা তুমুল ঝড়ের পর প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা হয়, পরেশ বাবুর মুখে যদিও সেইরূপ একটা বিষাদের শান্ত ছায়া পতিত হইয়াছে, তথাপি তিনি সকলকে সে ভাব জ্ঞাপন করিতে অনিচ্ছুক। তিনি যথা-সম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

আজ সরযূর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। পরেশ বাবু গভীর বেদন বুকে চাপিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভবেশ ও জিতেন তাহাদের দিদির কাছে

থাকিয়া দুই একটী কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। ভবেশের মনে আজ শান্তি নাই। যথাযথ কার্য্যাদি দিনেই সম্পন্ন হইল। রাত্রে ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত।

আহারান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছে। পরেশ বাবু, অনুপমা ও আর সকলেই শয়ন করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় দুইটা। খুব গরম বোধ হওয়ায় ভবেশ জিতেনকে বলিল—'জিতেন, চল্ ছাদে গিয়ে শুই।'—উভয়ে একটি মাদুর ও বালিশ লইয়া ছাদের উপর আসিয়া শয়ন করিল। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে; উভয়েই শান্তি অনুভব করিল। শয়ন করিয়া ভবেশ ও জিতেনের মধ্যে বন্যার বিষয় কথোপকথন হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভবেশ বলিল— 'জিতেন! ঘুমিয়েছিস্?' কোন উত্তর না পাইয়া ভবেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। পাশ ফিরিতেই ভবেশ যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। সে দেখিল, ছাদে উঠিবার সিঁড়িতে ঠিক সরযূর মতন কে একজন দাঁড়াইয়া আছে! কিছুক্ষণ দেখিয়া সে চিনিল—সরযূই বটে,—তাহার দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে! ভবেশ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। তাহার বোধ হইল যেন সেই মূর্ত্তি হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভবেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় জিতেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া দেখিল—ভবেশ পাশে নাই। ভাবিল, সে নীচে গিয়া শুইয়াছে। জিতেন মাদুর ও বালিশ হাতে নামিয়া আসিল। নীচে আসিয়া দেখিল— ভবেশ নীচেও নাই। ইহাতে জিতেন একটু অবাক্ হইয়া গেল। সে তখন ভবেশের বিছানার উপর বসিয়া ভবেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কৈ—ভবেশ ত আসিল না? জিতেন বড়ই ভীত হইল। সহসা তাহার কলিকাতার সেই কথা মনে পড়িল। 'তবে কি ভবেশ'—না, জিতেন সে কথা ভাবিতে পারিল না। যখন সবেমাত্র ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে তখন ভবেশের জন্য জিতেন অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়া বাড়ীখানি [illegible] তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল— কিন্তু ভবেশকে পাইল না। তখন সে ধীরে ধীরে আসিয়া অনুপমাকে ডাকিল। অনুপমা উঠিলে সে তাহাকে সকল কথা বলিল। অনুপমা ব্যস্ত হইয়া পরেশ বাবুকে ডাকিল। চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। গ্রামের মধ্যে

হুলুস্থুল পড়িয়া গেল—কিন্তু কোথায়ও ভবেশের সন্ধান পাওয়া গেল না। বৌত্র উঠিল। জিতেন অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সেও খুঁজিতে বাহির হইল। সে নদীর তীর দিয়া চলিতে চলিতে কিছুদূর গিয়া অনতিদূরে একটি জনতা দেখিতে পাইল। ইতিমধ্যে একটি লোক, সম্ভবতঃ পরেশ রায়েরই প্রজা, ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—'বাবু শীগ্‌গির আসুন!'—জিতেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বোধ হইল যেন পৃথিবী তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে। সে দেখিল, যে স্থানে সরযূকে দাহ করা হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে ভবেশ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। জিতেন ছুটিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল,—কিন্তু হায়!' সে দেহ প্রাণহীন। জিতেন আর দাঁড়াইতে পারিল না—টলিতে টলিতে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

---

# শান্তি।

( শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কোন্নগর )।

অভ্যুদয় লাভে লোকের যেমন আহ্লাদ জন্মে, পরম তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন দৃষ্টাত্মা, ধীমান্ ব্যক্তিরা সেই প্রকার সদাসর্ব্বদা পরম সুখে বিচরণ করেন। সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের শোক নাই, স্পৃহা নাই এবং কোনরূপ প্রার্থনাও নাই। তাঁহারা শুভাশুভ কার্য্যমাত্রে প্রবৃত্ত হইলেও, অপ্রবৃত্ত। তাঁহাদের অবস্থান এবং অনুষ্ঠান, উভয়ই অতি বিশুদ্ধ। তাঁহারা পরমাত্মায় অধিষ্ঠান ও হেয়োপাদেয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত বিশুদ্ধ পথে বিচরণ করেন এবং তাঁহারা আগমন করিয়াও আগমন করেন না, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না এবং কথা কহিয়াও কথা কহেন না। মন সর্ব্বচেষ্টাবিহীন ও শান্তি-রসাস্পদ হইলে, চন্দ্র বিম্বে অমৃতের ন্যায়, তাহাতে সুখের সঞ্চার হয়; এবং হেয়োপাদেয়-বোধ পরিহার পূর্ব্বক পরমার্থ পদ লাভে সমর্থ হইলে, যাবতীয় কর্ম্মাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ণ শশীর অমৃতরাশির যেরূপ পরিমাণ হয় না, বিষয়-বাসনা ও ইন্দ্রজালাদি কৌতুক তিরোহিত হইলে, তেমনই অপরিমেয় আনন্দের উদয় হয়; আত্ম-তত্ত্ব

অবগত হইলেই প্রকৃত সুখলাভ হইয়া থাকে। অতএব যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন অনুক্ষণ ধ্যান, মনন এবং নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিতে হয়। স্বকীয় অনুভব, শাস্ত্রচর্য্যা ও গুরূপদেশদ্বারা কার্য্যনিষ্ঠতা লাভ হইলেই আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়। শাস্ত্রার্থ এবং মহাজন বাক্য অগ্রাহ্য করিলেই, নিরতিশয় কষ্ট উপস্থিত হয়। মূর্খতা যেমন দুঃখ ও বিষাদের হেতু, ব্যাধি বা অন্যবিধ আপদ সেরূপ নহে। যে মূর্খ, সেই মৃত। আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সেই জীবিত। এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞানই—জীবন ও মৃত্যু। শাস্ত্রাদির অনুশীলনদ্বারা এই মূর্খতা দূর হয়। সামান্য অসামান্য আপদমাত্রই মূর্খতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরাব হস্তে চণ্ডালালয়ে ভিক্ষা করাও ভাল, অথবা ঘোর অন্ধকূপ তরু-কোটরে কীটরূপে কালক্ষেপ করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি মূর্খ হওয়া ভাল নহে।

বিবেক-রূপ প্রভাকরের উদয় না হইলে, মনোরূপ পঙ্কজ প্রফুল্ল হয় না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, এ মহী-মণ্ডলে হরিহরাদির ন্যায় সুখে বিচরণ করেন। ইহ সংসারে দুঃখের যেমন সীমা নাই, তেমনই সুখই, ইহাতে অশেষ দুঃখের হেতু। অতএব তৃণলবের ন্যায়, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর সুখে আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি ও অনায়াস সাধ্য অনন্ত পরমপদ সিদ্ধি জন্য কৃতযত্ন হ'য়েন। যাঁহাদিগের মন বিগত জ্বর ও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই পুরুষোত্তম ও প্রকৃত পুরুষার্থ ভাজন। সেইরূপ, যাঁহারা বিবিধ বিষয়ভোগে সন্তুষ্টচিত্ত, অর্থাৎ বিষয়ভোগেই নিরন্তর তৃপ্ত,—তাহারা কূপ-গর্ভস্থ অন্ধ ভেকের ন্যায় সন্দেহ নাই। যাহারা মিত্রবৎ ব্যবহারশীল, দুষ্কর্ম্মশালী, দুরন্ত, শঠ শত্রুর আনুগত্য করে, সেই মন্থরবুদ্ধি মূঢ়গণ দুঃখ হইতেও দুঃখে, ভয় হইতেও ভয়ে, দুর্গম হইতেও দুর্গমে এবং নরক হইতেও নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণিক সুখ দুঃখে কিছুই লাভ নাই। বৈরাগ্য ও সবিবেক পরায়ণ পুরুষেরাই, ভোগ ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়েন। বৈরাগ্যের অভ্যাস জনিত সুবিবেকের আশ্রয়ে আপদস্বরূপ সংসার-সাগর অনায়াসেই উত্তরণ করা যায়। বিজ্ঞেরা বিষমূর্চ্ছনার ন্যায়, সংসার-মায়ায় অবস্থিতি করেন না। এই আপদরূপ সংসারে অবস্থিতি করা, আর দহ্যমান গৃহমধ্যে উচ্চ তৃণ-শয্যায় শয়ন করা, একই কথা। যাহা পাইলে, আর

আসিতে ও শোক-মোহে পতিত হইতে হয় না, সেই পরমপদ অবশ্যই আছে, সন্দেহ নাই। যদি তাহা না থাকে, তাহার বিচারে গুণ ভিন্ন দোষ নাই। আর যদি থাকে, তবে তাহার আশ্রয়ে সংসার-সাগর অনায়াসে পার হওয়া যাইবে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহাতে অপায় নাই, শঙ্কা নাই এবং ভ্রম নাই, সেই পরম পদে একতা ভিন্ন বাঞ্ছা লাভের গত্যন্তর নাই। ঐ পদ প্রাপ্তির জন্য কিছুই কষ্ট করিতে হয় না; এবং বন্ধু, বান্ধব, ধন, হস্তপদাদি-সঞ্চালন, দেশদেশান্তর গমন ও শারীরিক ক্লেশাদি দ্বারাও ইহার উপকার হয় না। একমাত্র মন জয় করিলেই ইহা পাওয়া যায়। বিবেক, বিচার, বিষয়-বাসনা-বিসর্জ্জন ও একাগ্রতা দ্বারা এই পরম পদ সাধ্য ও বিনির্ণীত হইয়া থাকে। পরম পদ রূপ আসনে আরূঢ় ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু নাই। সাধুরা নির্দ্দেশ করেন, ঐ পরম পদই সমস্ত সুখের সীমা ও পরম রসায়ন। পার্থিব বা স্বর্গীয় সুখমাত্রই ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখের নামান্তর মাত্র। সুতরাং মনোজয়ে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মন জয় করিলে যে শান্তি, সুখ ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, সে পরমানন্দের ক্ষয় নাই। পরম পদ প্রাপ্ত হইলে, মন যেমন মালিন্য পরিহার ও পরম শান্তভাব অবলম্বন করে, তেমনই সকল বিষয়েই ভ্রান্তি-বোধ তিরোহিত ও সকল বিভ্রম বিদূরিত হয় এবং কোন অভীষ্ট বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা বা অনাকাঙ্ক্ষা থাকে না।

এই সুখ-দুঃখময় সংসাররূপ অতি দীর্ঘ সংসার মরুস্থলীতে একমাত্র শান্তি সহায়ে সুধাকরের বিমল স্নিগ্ধ রশ্মির ন্যায় পরম শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শান্তিই এই দুঃখময় ও অসার সংসারে পরম শ্রেয়োময় পরম পদ এবং শান্তিই নিখিল কল্যাণের হেতু। শান্তি গুণের সান্নিধ্যযোগ বশতঃ যাঁহার আত্মা শীতল হইয়াছে তিনি শত্রু হইলেও মিত্র। শমরূপ সুধাকরে, আশয় অলঙ্কৃত হইলে, ক্ষীরোদ সাগরের ন্যায় বিশুদ্ধতা সমুচ্ছলিত হয়। যাঁহাদের হৃদয় রূপ কোষে শম রূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহাদিগকে দ্বিহৃৎপদ্ম কহে এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। মুখচন্দ্রে শমশ্রী প্রতিভাত হইলে, মানবের যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা দর্শনমাত্র ইন্দ্রিয়গণ অকৃষ্ট হইয়া থাকে। শমরূপ ঐশ্বর্য্যে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভূত হয়, ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য প্রাপ্তিতেও সেরূপ আনন্দ থাকে না। মিহিরের উদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, শান্তির আবির্ভাবে দুরন্ত দুঃখ,

দুঃসহ তৃষ্ণা ও দুর্নিবার মনোবেদনা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়। মনই প্রসাদের হেতু এবং মনই বিষাদের কারণ। যে মনে শান্তি নাই, তাহাতে প্রসাদ নাই। সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্যবান্ শমশালী সাধু ব্যক্তিরা অনায়াসেই পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। জননী যেমন পুত্রের, সর্ব্বত্র সমদর্শী পুরুষ তেমনই ক্রূর অক্রূর সকলেরই পরম বিশ্বাসভাজন। শম যেমন আন্তরিক অনুপম আনন্দের আবিষ্কর্ত্তা, অমৃত বা অতুল ঐশ্বর্য্যও সে প্রকার নহে। শমরূপ অমৃতের অভিষেকে অশেষবিধ আধিব্যাধি অপনীত ও অতিমাত্র আশ্বাস উদ্ভূত হইয়া থাকে। মন বা বুদ্ধি শীতল বা শান্তভাবে থাকিলে, আহার-বিহারাদি নিখিল ব্যাপারই মধুর বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু শান্তি না থাকিলে, কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি, তখন সুখেও সুখ ও আমোদে আমোদ বোধ হয় না। তখন উত্তমকেও অধম বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে শান্তি না থাকাই বিকার। এই বিকার সুস্থ শরীরেও ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং রোগজনিত বিকার অপেক্ষা শান্তিহীন অবস্থার বিকার অতীব ভয়ঙ্কর। শান্তিই জীবন এবং অশান্তিই মৃত্যু; অথবা শান্তিই স্বর্গ অশান্তিই নরক। শান্তি যেমন নির্ব্বাণ-সুখ সমুৎপাদন করে, সেরূপ আর কিছুই নহে।

সমস্ত সংসার শান্তিরই পক্ষপাতী। এ বিষয়ে দেব, দানব, পশু, পক্ষী বা অন্য কোন যোনির প্রভেদ নাই। শরে যেমন বজ্রের ভেদ হয় না, সেইরূপ শান্তিরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে শরীর আবৃত রহিলে, কোন রিপুই কিছু করিতে পারে না। শান্তিদ্বারা লোকের যেরূপ শোভা হয়, অপর কিছুতেই সেরূপ শোভা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু প্রাপ্ত হইলে, যে প্রকার সন্তোষ-সঞ্চার হয়, শান্তিদ্বারা ততোধিক সন্তোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোক-সম্মত এই শমগুণে অলঙ্কৃত, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকেই জীবিত বলে। পুরুষ শমগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক অনুদ্ধত হইয়া যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা লোকমাত্রেরই পরম আদরণীয় হয়।

শুভাশুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ বা আস্বাদন করিয়া, যাঁহার হর্ষ বা গ্লান উপস্থিত হয় না, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি শমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ভাবী সুখের অভিলাষ ও বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা যে ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ বুদ্ধি সহায়ে সকল কার্য্যেই সমদৃষ্টি স্থাপন

করেন, তাঁহাকেই শান্ত বলে। বিপদ্, সম্পদ্, জীবন, মরণ ইত্যাদি সর্ব্ব অবস্থাতেই যিনি নির্ম্মল ও নিরাকুল, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি হর্ষ বা শোকাদি স্থানে থাকিয়াও থাকেন না এবং হর্ষ বা শোক কিছুই প্রকাশ করেন না, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর প্রতিই অমৃতবৎ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বিষয়ী হইলেও অবিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার করেন ও যিনি সতত শীতলচিত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিকেই শান্ত বলে। তপস্বী, বহুদর্শী অথবা গুণবান্ ইত্যাদি সকল প্রকার লোকের মধ্যে শমশীল পুরুষের সর্ব্বাধিক দীপ্তি প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, শান্তিই নিখিল গুণের সীমা ও পৌরুষের ভূষণ এবং সঙ্কট ও ভয়স্থানেও পরম প্রতিভা বিস্তার করে,— যে প্রতিভার কোন কালেই ক্ষয় বা অবসাদ নাই। যোগিজন যেমন শান্তি-সহায়ে পরমপদে অধিরূঢ় হয়েন, আমাদেরও সেইরূপ মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত শম-গুণ অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বভুবন-প্রকাশক পূর্ণ শশীর দিব্য প্রতিভাও শান্তির প্রতিভায় তিরস্কৃত হইয়া থাকে।*

---

# মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার।

## ( মৌলবী আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ )।

উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইলে বাঙ্গালীগণ পৃথিবীর যে কোন স্থানে স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাঠকগণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয়ের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে দেখিয়া থাকিবেন

---

* মহাবাশিষ্ঠ হইতে সার-সঙ্কলনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে এই 'শান্তি'—গোঁড়্‌পাড়া নিবাসী, পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ জীবনবিহারী সিংহকে আশীর্ব্বাদসহ উপহার প্রদত্ত হইল।

লেখক।

আমাদের চট্টগ্রামের স্বর্গীয় কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ও এবম্বিধ "বিদেশী" বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি শুধু চট্টগ্রামের নয়, সমগ্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের গৌরব ছিলেন। তাঁহার জীবন কাহিনী নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলীর অবতারণা করিব।

মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ খৃষ্টীয় ১৮৩৬ অব্দে চট্টগ্রাম জেলাস্থিত পটীয়া থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীদাস ও মাতার নাম প্রিয়বন্তী। তিনি জাতিতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। ষষ্ঠীচরণের পিতা কালীদাস পিতৃভক্ত, ভগবদ্ভক্ত, ধার্ম্মিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন। ইনি স্বীয় গ্রামে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন; এবং ভিন্ন গ্রামেরও ব্রাহ্মণ, দরিদ্র এবং স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট হইতে অর্থ লইতেন না। তিনি প্রতি মাসে যত টাকা উপার্জ্জন করিতেন,—তত আনা পয়সা গরীব ছাত্রদিগের মাহিয়ানা স্বরূপ দান করিতেন। দেব দ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। কথিত আছে, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে কোন জিনিষ নিবেদন না করিয়া তিনি তাহা খাইতেন না।

চড়ক পূজা উপলক্ষে, ১লা বৈশাখে, তিনি একটী মেলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি "জয়লা কুমারীর মন্দির" স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" পুস্তকের বিষয় আমি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 'সাহিত্য পারিষদ্ মন্দির' হইতে প্রকাশিত এবং মল্লিখিত 'বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' পুস্তকে সমালোচনা করিয়াছি। পুস্তকখানি "কালীদাস বৈদ্য কৃত" বলিয়া লিখিত আছে। কালিদাস কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, তজ্জন্য দেশে তিনি কালিদাস বৈদ্য নামে সুপরিচিত ছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণের নামের সঙ্গে 'বৈদ্য' শব্দ যোগ করা হয়। 'দেব' এই বংশের কুলগত উপাধি; 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি; 'বৈদ্য' ইহাদের ব্যবসায়-গত উপাধি। কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ মাণিকরাম দেব মজুমদার ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী চিত্রপুর গ্রাম হইতে নবাব আলী মোহাম্মদ খাঁর সঙ্গে দেওয়ানী কার্য্যোপলক্ষে চট্ট-

গ্রামে উপস্থিত হন বলিয়া কথিত আছে।* চন্দননগর হইতে উক্ত মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক পুরোহিত, মদন নামক জনৈক পরামাণিক ও জয়গোপাল নামক জনৈক ভৃত্য আসিয়াছিল। মাণিকরাম কার্য্যদক্ষতা গুণে নবাব সাহেব হইতে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানীয়া থানার অন্তঃপাতী থাগরিয়া গ্রাম জায়গীর এবং 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। মাণিকরামের নয়টী সন্তান ছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন চন্দননগরে ফিরিয়া যায়। চতুর্থ সন্তান গোবিন্দরাম নবাবী আমলে চট্টগ্রামস্থ খাসমহাল আফিসের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি পটীয়ার নিকটবর্ত্তী কিছু স্থান সংগ্রহ করিয়া আবাদ করেন, ঐ স্থানটি 'গোবিন্দের খিল' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কালক্রমে 'গোবিন্দের খিলের' স্থানে উহা এখন 'গোবিন্দার খিল' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 'গোবিন্দার খিল' এখন একটী সুন্দর গ্রাম। এই গোবিন্দরাম পটীয়া থানার অন্তর্গত গুয়াদণ্ডী গ্রামে একটী দীঘি খনন করান; ইহা 'মজুমদারের দীঘি' নামে খ্যাত হইয়াছে। ষষ্ঠীচরণ এই গোবিন্দরামের বংশধর। মাণিকরামের পঞ্চম পুত্র ভবানীচরণ ও ষষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ স্বীয় স্বীয় নামে থাগরিয়া গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করাইয়া গিয়াছেন। এখনও উক্ত গ্রামে 'ভবানী মজুমদারের দীঘি' ও 'লখাই মজুমদারের দীঘি' বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ষষ্ঠীচরণের ব্যবসায় ছিল—কবিরাজী। তিনি ওকালতী পরীক্ষা পাশ করিয়া মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ গ্রহণ না করিয়া তিনি পৈতৃক কবিরাজী ব্যবসায়ই আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কুলজী দৃষ্টে জানা যায়, কবিরাজ মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন। তিনি প্রথমতঃ চট্টগ্রামে কবিরাজী ব্যবসায় করিয়া ভূয়সী প্রশংসালাভ

---

* চট্টগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে নবাব মুজাফর খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও মোহাম্মদ খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়দের কুলজীতে উল্লিখিত আলী মোহাম্মদ খাঁ ও ইতিহাসোক্ত এই মোহাম্মদ খাঁ সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন।

লেখক

করিয়াছিলেন; তৎপরে তীর্থ পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া তিনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। তীর্থ পরিভ্রমণ কালে তিনি কিছুদিন আগরতলা, বর্দ্ধমান, হায়দারাবাদ, মহিশুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজ্যের রাজন্যবর্গের গৃহ চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া অবশেষে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহারাজের গুরুদেব রঘুনাথ পণ্ডিতের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজগুরুর নিকট শুনিতে পাইলেন যে, কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের পত্নী কঠিন অশ্মরী রোগে পীড়িতা; তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখনকার প্রধান প্রধান দেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণকে একে একে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার আরোগ্য-বিধানে কৃতকার্য্য হন নাই; সর্ব্বশেষে সকলেই 'আশা নাই' এইরূপ মত প্রকাশ করায় তাঁহার চিকিৎসার ভার ষষ্ঠীচরণ কবিরাজের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি এক সপ্তাহকাল চিকিৎসা করিয়াই রোগিণীকে রোগমুক্ত করেন। ইহাদ্বারা কবিরাজ মহাশয়ের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মহারাজ, তদীয় পত্নী এবং যুবরাজ—তিন জনেই কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহাকে তিন খানি স্বর্ণ-নির্ম্মিত ইষ্টক উপহার প্রদান করেন। ইষ্টকত্রয়ে কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্বের কথা লিখিত আছে এবং মহারাজ, যুবরাজ ও রাণী মাতার নামও তদুপরি খোদিত আছে। এই সময় হইতে তিনি কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের গৃহ-চিকিৎসক এবং নর্ম্ম-সচিব (Aide-de-Camp) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজের পুত্রগণ তাঁহাকে "কাকাবাবু" বলিয়া ডাকিতেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

ষষ্ঠীচরণ কাশ্মীর নরেশের এতদূর বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন যে, রাজ্য সংক্রান্ত বহু গোপনীয় বিষয় তাঁহার পরামর্শানুসারেই মীমাংসিত হইত। ষষ্ঠীচরণের সৌভাগ্যোদয়ে তদ্দেশীয় ঈর্ষাপরায়ণ কতিপয় ব্যক্তি একবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টাও করিয়াছিল। এই অপরাধে লছমন্ দাস ও আওয়াল সিংহের কারাদণ্ড হয় এবং ষষ্ঠীচরণকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য মহারাজ দুই জন শিখ শরীর-রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা নগরীতেও তিনি অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ৺মহাত্মা চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পত্নী বহুদিন রোগে ভুগিতেছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন সর্ব্ব-প্রধান ডাক্তার এবং কবিরাজগণ তদীয় পত্নীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারেন না। সর্ব্বশেষে তাঁহার চিকিৎসার ভার ষষ্ঠীচরণ কবিরাজের উপর প্রদত্ত হইল। তিনি এখানেও এক সপ্তাহকাল চিকিৎসা করিয়া রোগিণীকে নিরাময় করেন। তিনি কিছুকাল বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেক বিশিষ্ট কবিরাজেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তৎপর তাঁহারা সকলে, তাঁহাকে টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতে অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে, অনুরোধ করেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া, ষষ্ঠীচরণ পুনরায় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র কাশ্মীরে চলিয়া যান। তিনি কাশ্মীর-মহারাজ রণবীর সিংহের (Aide-de-Camp) নর্ম্ম-সচিব রূপে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে গিয়াছিলেন এবং তথায় প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি একবার বাড়ী আসিয়াছিলেন। জন্মভূমিতে অবস্থান কালে ষষ্ঠীচরণের নিকট মহারাজ রণবীর সিংহের মৃত্যু-সংবাদ তারযোগে প্রেরিত হয়। মহারাজের মৃত্যুর পর কুমারগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে যুবরাজ প্রতাপসিংহ ষষ্ঠীচরণের নিকট তার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে কাশ্মীরে লইয়া যান; ষষ্ঠীচরণও কাশ্মীরে গিয়া রাজকুমারদিগের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিয়া দেন এবং যুবরাজ প্রতাপ সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি বিরোধ মীমাংসাদি করিতে বড়ই সিদ্ধহস্ত ছিলেন; সীতাকুণ্ডে মোহন্ত কিশোরবনের সঙ্গে তত্রত্য অধিকারীদিগের বহু বর্ষ ব্যাপী বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। চট্টগ্রামের অনেক বিশিষ্ট লোক এই কলহ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। কবিরাজ মহাশয় এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সীতাকুণ্ড তীর্থে গমন করেন ও তথায় একটী বিরাট নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। বহু সহস্র লোক এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। অবশেষে সীতাকুণ্ডের মোহন্ত-কেই অধ্যক্ষ-পদে বরণ করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কবিরাজ মহাশয়ের

সহৃদয়তায় ও শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মোহন্ত ও অধিকারীদিগের মধ্যে তিনি একটী দৃঢ় প্রীতিবন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণ একবার যখন চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে নিলাম ডাকিতে যান, তৎকালে তদানীন্তন কালেক্টর মেন্‌সন্ সাহেব তাঁহাকে স্বীয় এজলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন দিয়াছিলেন। এতাদৃশ সম্মান চট্টগ্রামে অদ্যাপি আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠীচরণ বহু অর্থব্যয়ে পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ সমাপন করিয়া বহু সহস্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, মগ এবং মুসলমানকে অকাতরে অন্নদান করেন। দেশীয় লোকেরা বলেন যে, এরূপ জাঁকজমকপূর্ণ পঞ্চাগ্নি যজ্ঞের কথা তাঁহারা কখনও শুনেন নাই। তিনি স্বীয় নামে দীর্ঘিকা-খনন, রাস্তা-নির্ম্মাণ, স্বীয় জননীর নামে রাস্তা নির্ম্মাণ, স্বীয় গ্রামে "ষষ্ঠীগঞ্জ" নামে হাট স্থাপন, চট্টগ্রামস্থ বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চাঁদপুরে স্বীয় নামে হাট স্থাপন, চট্টগ্রাম সহরে শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরীর বর্ত্তমান ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ,স্বীয় মাতাপিতার চিতার উপর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, ইষ্টদেবের চিতার উপর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, পঞ্চদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ, সীতাকুণ্ডে কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা, সুচক্রদণ্ডী গ্রামে একটি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল, একটি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয় এবং কাশ্মীরে "সরকারী দাবাই খানা" নামে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার অতুলনীয় দান ও অনুপম ভ্রাতৃবাৎসল্য চিরদিন তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় গ্রামে তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া "গিরীশ-লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এবম্বিধ আরও বহু প্রকার লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অধিবাসি বৃন্দের পানীয় জলের সুবিধার জন্য তিনি স্বীয় গ্রামে ও জমিদারীতে ন্যূনাধিক ত্রিশটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন; কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রামস্থ বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চান্দপুর নামক স্থানে জনৈক মুসলমান ফকিরের কবরে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমান ফকিরের প্রতি কবিরাজ মহাশয়ের শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। এত দান করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ৫৪ বৎসর বয়সে কবিরাজ মহাশয় বারাণসী ধামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ষষ্ঠীচরণের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপসিংহ বিশেষ শোক প্রকাশ

করেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য ৮০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে কাশ্মীর মহারাজ তদীয় রাজ্যের আফিসাদি একদিনের জন্য বন্ধ দিয়াছিলেন। ষষ্ঠীচরণের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন মজুমদার এম, এ, ভিষগাচার্য্য মহাশয়ও কাশ্মীরের মহারাজ প্রতাপসিংহের নিকট হইতে ২০০৲ টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল ও ৩০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল কাশ্মীরের মহারাজ প্রতাপসিংহের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সংবাদ মহারাজ তারযোগে ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পটীয়া হাই-স্কুলের প্রসিদ্ধ শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বর্ত্তমানেও কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি কাশ্মীর মহারাজের অনুগ্রহ সূচনা করিতেছে।

ষষ্ঠীচরণ তিন বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম স্বরূপা, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কাশীশ্বরী এবং তৃতীয়া পত্নীর নাম বিশ্বেশ্বরী। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী, পশ্চিম বাঙ্গলার মাইনগর সমাজের জয়গোপাল বসুর কন্যা। জয়গোপাল যমুনা কেনাল ( Canal ) আফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে আর কোন চট্টগ্রামবাসী লোক পশ্চিম বাঙ্গলার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কবিরাজ মহাশয়ের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন মজুমদার ভিষগাচার্য্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এম্,এ, পাশ করিয়া এবং বহুদিন বারাণসী ধামে কবিরাজী শিক্ষা করিয়া, এখন কলিকাতা নগরীতে কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছেন। হরিরঞ্জন যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া কমিশনের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বিশিষ্ট ডাক্তার ব্যতীত কোন কবিরাজ এই পদে নির্ব্বাচিত হয়েন নাই।

কবিরাজী শাস্ত্রে ষষ্ঠীচরণ যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন :—জয়মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী, ঊষাহরণ, শনি-চরিত্র, শুকাখ্যান-লহরী, সখাদাসী-সখীদাস—বৈষ্ণবের সং (প্রহসন), ভদ্রবিদ্যানিধির সং (প্রহসন), সীতারাম-সম্মিলন ও শ্রীবৎস-উপাখ্যান। এতদ্ভিন্ন তিনি হিন্দি ভাষায় "মোগলানী নুরজাহানের সং" নামে একখানা প্রহসনও লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিষয়ই

আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে হিন্দি ভাষায় যে ষষ্ঠীচরণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্যামা-সঙ্গীত আমার নিকট সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে দুইটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

( ১ )

রাগ—ঝাঁবোয়া ;—আড়াঠেকা।

আমার কি হ'বে কালিকে!
জীবন যাত্রা গত মা গো করি আজি কালিকে।
ম'জে বিষয়-সম্পদে না ভজিলেম ঐ পদে
ডুবিলেম ঘোর বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে॥
এ ভব-সিন্ধু অকূল ভে'সে মা পাই নে কূল
কুল-কুণ্ডলিনী কূল দেও ইন্দুভালিকে॥
প্রাণ যায় গো সন্তরি পে'লে না চরণ-তরী
শ্রীষষ্ঠীচরণ ভবি ত্রিলোক-পালিকে॥

( ২ )

মা গো ব্রহ্মময়ি সারাৎসারা!
ত্বং হি বিশ্বরূপা, গুহে চিৎস্বরূপা
নিরাকারাকারা সাকারাকারা॥১॥
অনন্ত অদ্বৈত ত্বং হি বিশ্বমূলাধারা
স্থূল সূক্ষ্ম মোক্ষরূপা বিরাট আকারা।
ত্রিগুণ পূরিত ত্রিগুণ জড়িত
ত্রিগুণ রহিত হে নির্বিকারা॥২॥

সুদূর কাশ্মীরে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার প্রতি যে এরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় "দুর্গা-স্তোত্রং" রচনা করিয়াছেন; ইহা অনেকগুলি শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি

"নাড়ী-পরীক্ষা" সম্বন্ধে আর এক খানি কবিরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মৌলিক গবেষণা শক্তি দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠীচরণের দ্বিতীয় ভ্রাতা নীলাম্বরও এক জন বহুদর্শী কবিরাজ এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দেশের ছোট ছোট মোকদ্দমাগুলি নিজেই মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার বিচারে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকিত। তিনি জরীপের কাজে বড় বিচক্ষণ ছিলেন। ইনি পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একাগ্নি যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দিগম্বর চট্টগ্রামে কালেক্টরীর এক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীচরণের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ সস্ত্রীক ২।৩ বার ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার অতিথি-সেবা উল্লেখযোগ্য। ইনি বারাণসীতে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ষষ্ঠীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত লোক। তাঁহার বিনয়, শিষ্টাচার এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা একান্ত প্রশংসাযোগ্য। তিনি এক সময়ে চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে কেরাণী ছিলেন; কিন্তু চিরদিন বিদ্যানুরাগী বলিয়া সেই পদ ত্যাগ করিয়া, তিনি স্বীয় গ্রাম পটিয়ার হাইস্কুলে ৩৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি এক জন সুলেখক। তাঁহার রচিত "কল্পনা-প্রসূন" একখানি সুন্দর কাব্য। তিনি ইংরাজীতেও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজী কবিতা পড়িয়া চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ ডিক্‌সন্ সাহেব এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ লুসন্ সাহেব তাঁহাকে English Poet অর্থাৎ 'ইংরাজ কবি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিছুদিন হইল তিনি যুবক শিক্ষকদিগের সুবিধার জন্য শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে,—"The Teacher and the art of Teaching" নামে একখানা সুপাঠ্য ও সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়া সুধীবর্গের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। পূর্ণবাবুর সহধর্ম্মিণী দয়াময়ী দেবী বিদুষী, ধার্ম্মিকা, নিত্যধ্যানপরায়ণা, পরোপকারিণী, অতিথিসেবাতৎপরা, পতিগতপ্রাণা এবং মূর্ত্তিমতী দয়া ছিলেন। তিনি দেশের 'মা' ছিলেন; গরীব-দুঃখীকে অন্ন বিতরণ এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ বিতরণ—তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি কাশী, হরিদ্বার, গয়া, পুরুষোত্তম, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি অনেক তীর্থ

ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন শিবার্চ্চনা করিতেন এবং বিষ্ণুকে সচন্দন তুলসী দিতেন। তিনি অধিকাংশ পুরাণ নিজে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চণ্ডীচরণ গুহ; মাতার নাম নারায়ণী দেবী। পূর্ণ বাবুর তিন পুত্র,—দুর্গাবর, বরদাবিনোদ ও নলিনীরঞ্জন। দুর্গাবর চট্টগ্রামে কালেক্টরীর কেরাণী ছিলেন, কিন্তু শিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া ঐ পদ ত্যাগ করেন এবং শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। বরদাবিনোদ কবিরাজী করেন। তিনি স্বীয় গ্রামে শ্রীশ্রীমগধেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে একটী বিরাট মেলা স্থাপন করিয়াছেন। নলিনীরঞ্জন চট্টগ্রামে টেলিগ্রাফ আফিসে কার্য্য করেন।

কবিরাজ মহাশয় এ দেশের সর্ব্বত্র "ষষ্ঠী বৈদ্য" নামে সুপরিচিত। তিনি স্বীয় সৌভাগ্য ও অসামান্য প্রতিভাবলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির চরম সীমায় আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে ২০ লক্ষ টাকারও অধিক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পৈতৃক পর্ণকুটীরের স্থলে তিনি ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ ও বিস্তৃত জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত সৌভাগ্য লইয়া অতি অল্প লোকই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি এত লোকপ্রিয় ও খ্যাতনামা ছিলেন যে, তিনি চট্টগ্রাম জেলার যেখানেই যাইতেন, সেখানেই হাজার হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার বাড়ী একটী অন্নসত্রের ন্যায় ছিল। এত সৌভাগ্যশালী হইয়াও তিনি যে খুব বিনয়ী ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত একটী ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।—এক দিন তিনি পাল্কী করিয়া কোন লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়, পথিমধ্যে তাঁহার বাল্যকালের পারস্য ভাষার শিক্ষক,—জনৈক মুসলমান মৌলবী যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কবিরাজ মহাশয় পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত মৌলবীর চরণ-ধুলা মাথায় লইয়াছিলেন। ইহাতে মৌলবী সাহেব বিশেষ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার উন্নতি এবং দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প দিন মাত্র বাঁচিয়াছিলেন।—এখনও তাঁহার

বংশধরগণ সম্পন্ন। তন্মধ্যে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মজুমদার বি, এল, ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মজুমদার মহোদয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণবাবু সাহিত্যানুরাগী এবং সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় দানে মুক্তহস্ত এবং নিজেই জমিদারী পরিদর্শন করিতেছেন।

উপসংহারে, আমার বক্তব্য এই যে, ষষ্ঠীচরণের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি চট্টগ্রামে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি একাধারে একটী স্বাধীন রাজার এ, ডি, কং (নর্ম্ম-সচিব) ও গৃহ-চিকিৎসক এবং তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ, সাহিত্যিক, পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন-কর্ত্তা, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, দান-বীর, বহু অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তা, স্বদেশ-সেবক, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষায় সাহায্যদাতা ও সৎসাহসের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপ সিংহ তাঁহাকে পিতৃতুল্য জানিতেন। ষষ্ঠীচরণের নিকট মহারাজের লিখিত কয়েকখানি চিঠি, কবিরাজ মহাশয়ের বংশধরগণের নিকট এখনও আছে। কবিরাজ মহাশয়ের নামের পূর্ব্বে শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ মহারাজ ১১টী শ্রী লিখিতেন এবং চিঠির শেষ ভাগে 'সেবক পুত্র, দাস প্রতাপ সিংহ'—এই প্রকার লিখিতেন। পাঠক মহাশয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোথায় কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর, আর কোথায় চট্ট-গ্রামের ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ! ইহা চট্টগ্রামের অত্যন্ত গৌরবের বিষয়; শুধু চট্টগ্রাম কেন, সমস্ত বাঙ্গলারই গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। যে দিন কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীন নরপতি রণবীর সিংহের পত্নীর কঠিন অশ্মরী রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ডাক্তারগণ অপারগ হইয়াছিলেন, তখন সুদূর চট্টগ্রামের কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ, রাজ-মহিষীর আরোগ্য বিধান করিয়া, কি বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করেন নাই? সেই দিন কি পৃথিবীর ইতিহাসে, বর্ত্তমান যুগে অবজ্ঞাত, ঋষি-প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিজয়-নিনাদ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা গত হয় নাই? কিন্তু চট্টগ্রামের সে গৌরবের দিন এখন আর নাই। সে দিন আসিবে কিনা, কে জানে?

# অরূপের রূপ।

( শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত )।

বর্ণ গন্ধ গীতি রস পরশ মাঝারে,
ধ্রুব সত্য আপনারে রাখে আবরিয়া,
অনন্ত প্রান্তের মাঝে দিতে চাহে ধরা,
পুরুষ প্রকৃতি মাঝে মগ্ন আত্মহারা॥

হে পুরুষ! হে মায়াবী! হে শিল্পী প্রধান!
তোমারই রচিত বিশ্ব কল্পনা বিভাস;
শক্তী রূপে অবতীর্ণা সাকারা চেতনা,
রূপ মাঝে অরূপের বিভূতি ব্যঞ্জনা॥

মতিমান্! চাহ তব সেবিকার পানে,
তব দৃষ্টিপাতে তার সার্থক জীবন,
তাহার নয়ন মাঝে তুমি পাবে দেখা,
তোমারই স্বরূপ প্রেম সুন্দর কেমন॥

---

# বিধির বিধান।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( শ্রীমতী অমিয়বালা বসু )।

৫

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমেশ অলকারের বিষয় একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; যেহেতু তিন বৎসরের মিয়াদ ফুরাইয়াছে জানিয়াও দীনেশ তাহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র হাত-চিঠা লয়েন নাই। তাই যে বিশ্বাসঘাতকত

করিবে, দীনেশ তাহা আদৌ চিন্তা করেন নাই। তিনি কায়ক্লেশে অনেক করিয়া পাঁচ বৎসরের সুদ ও আসল পাঁচ শত টাকা লইয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর নিকট গেলেন।

বন্ধু সুদ সমেত সমস্ত টাকা লইয়া রমেশের নিকট অলঙ্কারের কথা উত্থাপন করিবামাত্র রমেশ কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—"সে তো নলিনের বিয়ের সময় বিক্রী ক'রে ফেলেছি।"

বন্ধুর দুই চোখ কপালে উঠিল—"সে কি কথা? বিক্রী ক'রেছ?—পরের গয়না?"

'তা আর কি ক'র্‌ব আমি? জানই তো, বন্ধকের তিন বছরের মেয়াদ দেওয়া থাকে, লেখাও আছে তাই। তিন বছর তো কেটে গেল, এদিকে হাতে নেই একটা পয়সা,—ছেলের বিয়েও এসে প'ড়্‌ল। মনে ক'রে দেখ দেখি, তোমার সঙ্গে যখনি দেখা হ'য়েছে—তখনি টাকার কথা বলেছি কি না? তোমরা টাকা দেওয়ার নামটিও ক'র্‌লে না—তখন কি করি আমি? ছেলের বিয়ে তো আর ফেলে রাখা যায় না, কাজেই বিক্রী কর্‌তে হ'ল। আচ্ছা ভাই, তুমিই বল না, কাজটা আমার কি নেহাৎ মন্দ হ'য়েছে?"

"না খুবই ভাল হ'য়েছে।"—বন্ধুর মাথা ঘুরিতেছিল, কম্পিত পদে দীনেশের কাছে ফিরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি সমস্ত কথা বলিলেন।

তখন দীনেশের সম্মুখে যেন সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। হায় হায়! ভাই হইয়া কেহ কি ভাইকে এমন করিয়া প্রতারণা করিতে পারে? এ জগতে আপনার লোক যতটা সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, অপরে বুঝি ততটা পারে না। পরের মনে দয়া থাকে, কিন্তু নিজের লোকের মনে দয়া নাই।

তাই, দীনেশ আজ নিজে রমেশের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভাই রমেশ, আমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দাও আমায়। তুমি যত টাকা চাও, আমি দিচ্ছি। উপেন ২।৪ দিনের মধ্যে আস্‌বে—সে এসে কি ভা'ববে? তার শ্বশুরও সেই দিন এখানে আস্‌বেন। তিনিই বা কি ভাব্‌বেন? ভাববেন,—ওঁর মেয়ের গয়না বেঁচে আমরা পেট চালিয়েছি! দাও ভাই, মিনতি কর্‌ছি তোমায়—"

রমেশ বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—"সে গয়না আপনার, তা কি আমি জানি? তা আমায় আগে বল্‌তে হয়!"

দীনেশ কাতর ভাবে তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন; সজল নেত্রে বলিলেন—"অত নিষ্ঠুর হ'স্‌নে রমেশ! মনে ক'রে দেখ্—আমি তোর বড় ভাই, ছোট বেলায় তোকে এই বুকে তু'লে নিয়ে কত বেড়িয়েছি, নিজে না খেয়ে কত সময় তোকে খাইয়ে কত তৃপ্তি লাভ করেছি,—তখন কোথায় ছিল তোর স্ত্রী-পুত্র-সংসার, রমেশ?—তখন তুই জান্‌তিস্—আমায়, আমি জান্‌তেম্—তোকে। আমি বরাবর তোকে সেই স্নেহের চোখেই দেখে আস্‌ছি।—তুই আজ সম্পূর্ণ অ'লাদা হয়ে গিয়েছিস্—তাই সে কথাও তোর মনে নেই। একবার মনে কর ভাই, আমি তোর সেই দাদা, তুই আমার সেই ছোট ভাই। ভাই হ'য়ে আমায় এমন অপমানিত করিস্ নে। তোর হাতে ধর্‌ছি—" দীনেশ রমেশের হাত খানা টানিয়া লইলেন; চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া সেই হাতের উপর জল পড়িতে লাগিল,—"বড় অপমান ভাই! বউমার বাপ যে আমায় এতটা নীচ মনে কর্‌বেন, তা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

সজোরে হাত টানিয়া লইয়া তীব্র ভাষায় রমেশ বলিলেন—"আপনি কি মনে করেছেন, বলুন দেখি? গহনা কি আমার ঘরে আছে যে, চাইবামাত্র বের ক'রে দেব? যদি বিশ্বাস না হয়,—যান্, নালিশ করুন গিয়ে। তিন বছরের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, মনে রাখ্‌বেন তা।—সোজা আদালত রয়েছে, চলে যান; আমায় আর বিরক্ত কর্‌বেন না।"

চোখের জল চোখেই শুকাইয়া গেল; বুকে একটা গভীর বেদনা পাইয়া দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"শোন রমেশ, আমি এর বিচারের জন্য কোথাও যাব না। মনে রেখ, জগতে এর জের মিটে গিয়েছে যদিও, কিন্তু উপরে যে বিচারালয় খোলা রয়েছে, সেটা একবার ভেবে দেখ!—সকলের চোখ এড়াতে পার্‌বে কিন্তু সেখানে যে সর্ব্বশক্তিমান্ দর্শক এক জন আছেন, তাঁর চোখ কিছুতেই এড়াতে পার্‌বে না।—এত দিন অনেক অত্যাচার করেছ, আমার জিনিষ সব তুমি দখল করেছ, আমি সব অকাতরে সহ্য করেছি, কিন্তু মর্ম্মে বড়ই আঘাত পেয়ে বল্‌ছি—'ভগবান্, তুমিই এর বিচার করো।'—জান বোধ হয়, পাপের ধন কারও চিরকাল থাকে না; তোমারও

ছেলে আছে—এখনও সাবধান হও। সংসারে পাপীর জয় বেশী দিন থাকে না!''

দীনেশ চলিয়া গেলেন।—রমেশের মনটা কেন যেন একটু খারাপ হইয়া গেল। নিজের জন্য তত ভাবনা নাই, যত ভাবনা একমাত্র পুত্র নলিনের জন্য। রমেশ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বিষয়াদির ভাবনায় ডুব দিলেন। বড় ভাইয়ের কথাগুলি বড় বেশীক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে রহিল না।

## ৬

রমেশ গৃহ মধ্যে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে তামাক টানিতেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল—'গহনাগুলো দেখা যাক্, উহার কত দাম হইতে পারে,—কাল সকালেই সেগুলি বিক্রয় করিয়া আসিতে হইবে।'

ঘর্ম্মসিক্ত স্থূল কলেবরটী যথাসম্ভব চালাইয়া রমেশ বাক্স হইতে আয়রণ চেষ্টের চাবি বাহির করিলেন।

'ওগো, আর ঘুমিও না, ওঠো একটা কথা শোন'—রমেশের আহ্বানে তরঙ্গিনী প্রথমটা আড়ামোড়া দিলেন, তাহার পর চোক না খুলিয়াই পাশ ফিরিয়া বলিলেন—কি জ্বালাতন!—দুপুরেও যদি একটু ঘুমুতে দেয়!—সারাদিন কেবল শোন—আর শোন! আর পারা যায় না—'

সে কথায় রমেশের বীর-হৃদয় একেবারে বসিয়া গেল। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরে বলিলেন—'বল্‌ছিলেম, একবার সিন্দুকটা খুলতে পার? সেগুলো দেখি। কাল সকালে কল্‌কাতায় গিয়ে বেচে ফেলে, সেই টাকা দিয়ে তোমার নেকলেশ আর বউমার জন্য চুড়ী আন্‌তে হবে। বেশী দিন ঘরে রাখলে, বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

যা হউক তরঙ্গিনীর মনে কথা কয়টী লাগিল। তিনি উঠিয়া সিন্দুক খুলিলেন এবং তাহার মধ্যে যে টিনের বাক্সে গহনা থাকিত—সেই বাক্সটী স্বামীর হস্তে দিলেন। রমেশ হাসিমুখে বাক্স খুলিলেন।

ও হরি! গহনা কোথায়?—বাক্স যে খালি!

তাহার হাত হইতে বাক্স মাটীতে পড়িয়া গেল। উভয়েই প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়

উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—'একি ব্যাপার—সে সব গেল কোথা?'

'মনে করে দেখ, অন্য কোথায় রেখেছ কি না?'

'কখনও না—কাল পর্য্যন্ত এখানেই ছিল,—দেখেছি।"

তার পর উভয়ে ঘরের সমস্ত বাক্স প্যাট্‌রা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন কিন্তু গহনা পাইলেন না। রমেশ বলিলেন—'কে এমন কাজ করলে?—যদি তাকে পাই, ত যমের বাড়ী পাঠাব।'

'ওগো এ কাজ কি অন্য কেউ ক'রেছে?—এ তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ড!'

"অ্যাঁ—নলিন!—সে এ কাজ করেছে? কেমন করে জান্‌লে তুমি?"

"সে আজ কয়েক দিন হতেই ব'লছে—'মা, বাবাকে গয়না গুলো ওদের ফেরত দিতে বল।'—তোমাকেও তো কাল দুপুর বেলা বল্‌ছিল। মনে নেই বুঝি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—বল্‌ছিল বটে!—তার পর—"

"তার পর আর কি, চুরি ক'রে বড় গিন্নিকে দিয়ে এসেছে।"

'বটে! এমন কুপুত্র হল আমার? দূর হ'ক সে—আমি আজ হ'তে তাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করলেম! আর কখনও তার মুখ দর্শন করবো না!'

'ছেলেটা হ'ত ভাল, কিন্তু মাটী করলে—ওই বড় গিন্নী। আবার বিয়ে যে দিয়েছ—বউটা যেন ভিজে বিড়াল। মুখে কথাটী নেই কিন্তু পেটে ওই সব বুদ্ধি আছে খুব।'

নলিনকে তখনি অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু সেত নাই-ই,—বউটীও বাড়ীতে নেই!

'আজ আসুক তারা, আগে অমন ছেলে-বউ দূর ক'রব—পরে অন্য কাজ।'—এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়া, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

## ৭

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নলিন সস্ত্রীক খিড়কী দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পিতা দেখিতে পাইয়াই পুত্রকে ডাকিলেন। নলিন পিতার নিকট-বর্ত্তী হইতেই রমেশ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—'গয়না তুই নিয়ে গিয়েছিস্?'

নলিন অবোবদনে উত্তর করিল—'হ্যাঁ।'

'কি করেছিস্ সে গয়না?'

'জেঠিমাকে দিয়ে এসেছি।'

'তবে রে হারামজাদ! বউ নিয়ে বেরো আমার বাড়ী হতে। আমি আজ তোকে ত্যাজ্য পুত্ত্বুর করলেম্।'

'বাবা'—নলিন আর কোন কথা বলিতে পারিল না; পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'আমায় মাপ করুন। একটা কাজ করে ফেলেছি, আর তার হাত নেই। আপনি তাড়ালে আমার আর আশ্রয় কোথায়?'

নির্দ্দয় পিতা সজোরে পা ছাড়াইয়া লইলেন, সেই পা নলিনের মুখে গিয়া লাগিল। আরক্তিম ফুলদল তুল্য কোমল ওষ্ঠ কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িয়া সে স্থান অনেকটা আর্দ্র হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া রমেশ বলিলেন—'এখনও গেলি নে তুই?'

নলিন মায়ের নিকট গিয়া বলিল—'মা, আমি দূর হয়ে যাই,—এই কি তোমারও ইচ্ছে? বল, তোমার কথা শোনবা মাত্র আমি চলে যাব।'

মায়ের প্রাণ তখন ফাটিয়া যাইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাকে বক্ষে টানিয়া লন। কিন্তু বউ ও ছেলেকে আর একটু শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"আমি কি বল্‌ব? তোমার ইচ্ছে হয় তোমার জেঠীমার কাছে যাও। আমরা তোমার পর—তারাই তোমার আপনার।"

নলিন আর একটীও কথা বলিল না, বালিকা পত্নীর হাত ধরিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

তখন আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছিল। ধরা-বক্ষ ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। শীঘ্রই ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল, এই ঝড়ে অনেকে গৃহহীন হইল। এই দুর্য্যোগে হতভাগা দম্পতি কোথায় গেল?

উৎকণ্ঠিতা মাতা বলিলেন—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, চাকরটাকে নিয়ে একবার খোঁজ কর তাদের। সে এই ঝড়ে বউটীকে নিয়ে কোথায় গেল? দুজনেই ছেলে মানুষ, কি বুদ্ধি আছে তাদের?"

"যা'বে আবার কোথায়? তারা আছে ওদের সেই খড়ো ঘরে; তার কি প্রাণের ভয় নেই?"

কি জানি কেন তরঙ্গিনীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না; সারা রাত্র উৎকণ্ঠায় তাহার ঘুম হইল না, ভোর রাত্রে তন্দ্রাঘোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া বসিলেন।

তখন সকাল হইয়াছে। পরিষ্কার নীল গগন-গায়ে তরুণ সূর্য্য-রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত রজনীতে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, আজিকার নির্ম্মল নির্ম্মেঘ আকাশ দেখিয়া কে তাহা বলিতে পারে?

তরঙ্গিনী উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে দরজা খুলিয়া নলিনের গৃহের পানে চাহিলেন। এখনও নলিনের ওষ্ঠের রক্ত সেখানে শুখাইয়া রহিয়াছে। হায়, তিনি কি পাষাণী!

শূন্যপ্রাণে বাসনের গোছা লইয়া তিনি ঘাটে গেলেন। মনে ভাবিলেন, কাপড় কাঁচিয়া তিনি নিজেই আজ দিদির বাড়ী যাইবেন এবং পুত্র ও বধূকে আদর করিয়া লইয়া আসিবেন; বধূটীকেও আদর করিয়া গৃহের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিবেন।

তাড়াতাড়ি করিয়া কাপড় কাচিবার জন্য তরঙ্গিনী জলে নামিতেছেন; এমন সময় তাহার পায়ে যেন কি একটা ঠেকিল। হাত দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই তাহা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভগবান্—ভগবান্! এ কি দেখাইলে? এ যে নলিন ও বালিকা-বধূর মৃত দেহ!

"বাবা গো—বাবা—নলিন—" বলিয়া ঘাটের উপর তরঙ্গিনী আছড়াইয়া পড়িলেন। চীৎকার শুনিয়া রমেশ ও পাড়ার অনেকে ছুটিয়া আসিলেন। দুইটী সোনার দেহ উপরে তোলা হইল। রমেশ বজ্রাহত-প্রায় নলিনের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আহা! এখনও পিতার নিষ্ঠুর পদাঘাতের চিহ্ন নলিনের ওষ্ঠে

অঙ্কিত আছে; বৃহদায়ত চোখ দুইটী আধ নিমীলিত; অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি শুভ্র হইয়া গিয়াছে;—বালিকা স্ত্রী তাহার বক্ষাবদ্ধ; তাহার এলায়িত ঘনকৃষ্ণ আগুল্‌ফবিলুণ্ঠিত কেশরাশি নলিনের দেহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মুখে যেন এখনও হাসির রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে;—জীবনে যাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, মরণেও যে তাহাকে ছাড়ে নাই,—এই সাফল্যেই যেন তাহার মুখখানি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * * * *

দুইটী সোনার দেহ একটী চিতায় দগ্ধ করা হইল। মূর্চ্ছিতপ্রায় শোকাতুর পিতামাতা প্রাঙ্গনে পড়িয়া রহিলেন। বিধাতার এই অমোঘ দণ্ড তাঁহাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল।

---

# শিশু পালন। *

( শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় )।

ইংরেজ কবি Mase Field গাহিয়াছেন,—দুঃখী শিশুকে আনন্দিত করিলে স্বর্গ-পথে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হয়, অনাথ শিশুকে গৃহে স্থান

---

* শিশু-পালন ও শিশু জীবন রক্ষার জন্য বর্ত্তমানে বহু প্রকার আন্দোলন হইতেছে। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি সাময়িক এবং বিশেষ ভাবে আলোচনা-যোগ্য। আমরা এই সম্বন্ধে "শিশু-পালন" নামক একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি; ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম বি, মহাশয় কলিকাতা হইতে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন;—মূল্য ॥০ মাত্র, ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ডাঃ বসু মহাশয় "স্বাস্থ্য-সমাচার" নামক পত্রিকাখানি পরিচালনা করিয়া এবং এবম্বিধ নানাপ্রকার সাধনা দ্বারা বস্তুতঃই দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছেন। "শিশু-পালন" পুস্তকখানি সকলকেই পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। সঃ

দিলে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশুকে জন্মদান করিলে ত্রাণকর্ত্তা খৃষ্টকে গর্ভে ধারণ করা হয়, সুতরাং তাহাতে জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়।

'Suffer the little children to come to me, and forbid them not; for of such is the kingdom of heaven'—Jesus Christ.

"শিশুগণকে আমার নিকটে আসিতে দাও, তাহাদিগকে বাধা দিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।"

কিন্তু আমরা এই নন্দন পারিজাত স্বরূপ শিশুদের কোনই যত্ন লইতেছি না, পল্লীতে দুঃখী, মাতৃক্রোড়-শায়িত শিশুর নীরব ব্যথা অনুভব করিতেছি না, কত শত দুঃখিনী মাতার অঞ্চলনিধি যে জীবন-মুকুলেই ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা আমাদের লক্ষ্য নাই। এই দেব-শিশুদল যে জন্মগ্রহণ করিয়াই, মাতৃ-ক্রোড়ে শুষ্ক বদনে শীর্ণ নয়নে পল্লীর অস্বাস্থ্যরূপ জলবায়ু প্রভাবে অকালে প্রাণ হারাইতেছে, তাহা কয় জন লক্ষ্য করিতেছেন? বহুকাল ধরিয়া, সমগ্র সভ্য জগতে শিশুগণের মঙ্গলার্থে মহা আন্দোলন চলিতেছিল, তাই বর্ত্তমানে দেশের ও বিদেশের সামাজিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ শিশুদিগের জীবন, চরিত্র গঠন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিয়া, চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং শিশুদিগের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের উপায় ও নিয়মাদি উদ্ভাবন করিতেছেন। খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"Whosoever shall receive this child in My name receiveth Me"

যে শিশুর সেবা করে—সে আমার সেবা করে।—ইউরোপ যেন খৃষ্টের এই বাণী শিরোধার্য্য করিয়া, শিশুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাই আজ ঘরে ঘরে এক একটী দেবতার সৃষ্টি হইতেছে। কবি Emerson গাহিয়াছেন,—

"O child of Paradise!
Boy who made dear his Father's Home,—
In whose deep eyes
Men read the welfare of the time to come"

হে স্বর্গীয় শিশু! হে পিতৃগৃহ আনন্দকারী, তোমার দীপ্ত নয়নে মানব জগতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ পাঠ করিতেছি।

বঙ্গকবি গাহিয়াছেন,—

"ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ

ধরায় উঠিছে ফুটি, ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি

নন্দনের এনেছে সংবাদ।"— রবীন্দ্রনাথ।

আমরা বর্ত্তমানে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারি —জ্ঞানে, ধনে, রাজনীতিতে হয়ত জগতের শীর্ষস্থানীয় হইতে পারি, কিন্তু যদি আমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু না করি, যদি বংশানুক্রমে আমাদের গৃহে অকর্ম্মণ্য সন্তান জন্মিতে থাকে—তবে আমাদের এ শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম সকলই বৃথা। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু যে ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার বেণ্টলীর মত এই যে,—বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবই এই ভয়াবহ মৃত্যুর কারণ। গোচারণ ভূমি রক্ষা এবং সাধারণ মধ্যে সমবায় প্রথায় উৎকৃষ্ট গোশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইলে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এতৎ সম্বন্ধে কেহই কিছু করেন নাই বা করিবার কোন চেষ্টাও করিতেছেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত যে এই বিষয়ে কোন সুফল হইবে, এরূপ মনে হয় না। দেশবাসীর অবস্থা এত স্বচ্ছল নহে যে তাঁহারা উপযুক্ত সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হন।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ন্যায় জীবনে কোনও কার্য্য এত মহান্, এত সুন্দর, এবং এত হিতকর নাই। তরুণ হৃদয়গুলি গড়িয়া তোলা, কোমল প্রাণগুলিকে উচ্চ শিক্ষা দান করা, তাহাদের গতি স্থির করিয়া দেওয়া—বাস্তবিকই একটী আনন্দকর ও স্বর্গীয় ব্রত। শিশুকালে শিশুর মন ও দেহ সুতপ্ত তরল লৌহের মত থাকে; এই সময়ে তাহাকে যে ছাঁচে ঢালিবে, ইহা সেই আকার ধারণ করিবে,—যে শিক্ষা দিবে, সেই শিক্ষাতে সে চিরকালের জন্য অভ্যস্ত হইবে, সুতরাং এই শিশুকালে সুশিক্ষাদ্বারা শিশুগণের সমাজগত বা বংশগত কুসংস্কার, ব্যাধি এবং পাপ সকল দূর করিতে হইবে। আধুনিক প্রচলিত অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি কার্য্যকর হইতে পারে না। অতি পূর্ব্বকালে, বাল্যকাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ছাত্রের যে নির্ম্মল শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল—তাহা কি

সুন্দর, কি পবিত্র, কি স্বাভাবিক! কিন্তু বর্তমানে—'সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই'—আধুনিক শিক্ষাগুণে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রী' পাইবার জন্য মস্তকে এক ঝুড়ি পুস্তকের বোঝা লইয়া পরীক্ষার্থী ছাত্র সাজিয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই বা দুর্ব্বলস্বাস্থ্য বালকদিগের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা হইতেছে না; এবং ইউরোপের ন্যায় আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকও নাই।

মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণ অবিলম্বে তাঁহাদের শিশুগণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হউন, কারণ শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির উপরই তাহার ভাবী জীবন, চরিত্র, কর্ম্মশীলতা ও প্রতিভা প্রভৃতি নির্ভর করে। আমাদের দেশের শিশু মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য হওয়ার প্রধান কারণ—বাল্য-বিবাহ ও শিশু-গণের প্রতি যত্নের অভাব। শিশুপালন সম্বন্ধে—মাতার কর্ত্তব্য—(১) শিশুদিগের শরীর সুপরিষ্কৃত রাখা (২) শিশুর খাদ্যের ও (৩) নিদ্রার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা (৪) শিশুদিগকে সুন্দর বাসস্থানে ও যথাসাধ্য খোলা জায়গায় রাখা (৫) সঙ্গী, ক্রীড়া ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্ত্তব্য—(১) বয়সানুযায়ী শিক্ষাদান (২) পুস্তকাদি নির্ব্বাচন (৩) চরিত্র গঠন (৪) বুদ্ধি পরীক্ষা (৫) নীতি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান (৬) স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ (৭) চক্ষু ও দন্ত প্রভৃতির দোষাদি বিষয় আলোচনা ইত্যাদি।

আজকাল পথে পথে ঘুরিয়া যে সকল অনাথ বালক শত শত লাঞ্ছনা সহ্য করে ও সারা জীবন আপনাকে ধিক্কার দেয়—যে শিশুগণ মাতৃক্রোড় হইতেই অকালে প্রাণ হারায় বা যাহারা সমাজের অন্তরালে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে, দুঃখ দৈন্যে যাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অনন্ত পাপসাগরে নিমগ্ন আছে,—আশা করি সমাজ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, ঘরের ছেলে ঘরে তুলিয়া লইবেন। এই প্রকারে ইউরোপের নানাস্থানে Orphan Home হইতে কত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও দেশ হিতৈষীর জন্ম হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালীর সে স্বার্থ ত্যাগ বা সে অনন্ত প্রেম কই? শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতার যত্ন ও স্নেহের উপরই তাহার অনাগত ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। বাঙ্গলার মাতৃকুল অতি কোমল হৃদয়া, দয়াশীলা এবং স্নেহপরায়ণা, কিন্তু তাহাদের

এই স্নেহাতিশয্যেই অনেক সময়ে শিশুর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কবি Whitman বলিয়াছেন,—যে স্থানে স্বাস্থ্যবান পিতা এবং শক্তিসম্পন্না শিক্ষিতা মাতা বাস করেন সে স্থান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য।—শিশু যে ভাবী মানব—The child is the father of man—শিশুগণই যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ ও জাতীয় উন্নতির আশা ভরসা স্থল এবং বৃদ্ধের প্রতি সম্মান এবং শিশুগণের প্রতি যত্ন দ্বারা জাতির যে মহত্ব প্রকাশ পায়—আমাদের জ্ঞানী, কর্ম্মপ্রাণ এবং সমাজ ও দেশ হিতৈষীগণ তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। তাই বঙ্গকবি দুঃখের সহিত গাহিয়াছেন ;—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননি!
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে,—মানুষ করোনি।"

---

# হরীতকী।

( শ্রীজীবনবিহারী সিংহ )।

হরীতকী (স্ত্রীং) হরি পীতবর্ণং ফলমিতা প্রাপ্তা ইতি হরীতা ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

হরীতকীর সংস্কৃত পর্য্যায়,—অভয়া, অব্যথা, পথ্যা, বয়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, সুধা, কায়স্থা, কন্যা, রসায়নফলা, বিজয়া, জয়া, চেতনকী, রোহিণী, প্রপথ্যা, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্বরা, ভিষকপ্রিয়া, জীবন্তী, প্রাণদা, জীব্যা, দেবী, বিজ্ঞা ইত্যাদি।

হরীতকীর বৈজ্ঞানিক নাম ( Terminalia chebula ) হরীতকী ফল বা উহার বৃক্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

উত্তর পশ্চিম ভারতে হরীতকীকে কহে—হর্, হর্রা, হরারা। পক্ক বা ডাঁশা হরীতকীকে কহে—হর্, পীলেহর, হার, পীলে, পীলা। শুষ্ক ও কচি ফলকে বলে,—বাল্-হর, জাঙ্গীহর, কালে-হর।

বাঙ্গালা প্রদেশে বৃক্ষ ও ফলের নাম—হরীতকী, হর্তুকী, হোবা।
কোল্ প্রদেশে—রোলা, হত্রা।
সাওতাল পরগনায—বোলি।
আসাম প্রদেশে—হিলিখা।
নেপালি—হেবো।
লেপ্চাদেশে—সিলিম্, সিলিম্কুঙ্গ।
ভুটান পাহাড় প্রদেশে—হান্, হানা।
উড়িষ্যায়—করেধা।
হরিদ্বার অঞ্চলে—হরীরা।
মধ্যপ্রদেশে—হর্‌রা, হীর্দী।
গোড্—কর্‌কা, হার্‌বো, হীর, হোর্‌দা, মহোকা।
যুক্তপ্রদেশে—হর্, হবৈর, হরারা, হরা।
পাঞ্জাব—হর্, হবাড্, হড়্, হসেনা।
সিন্ধুপ্রদেশে—হর্।
দাক্ষিণাত্যে—হাল্‌বা, হার্‌লা, হারা।
বোম্বাই প্রদেশে—হরি্দা, হার্দা।
মারাঠী—হীর্দা।
গুজরাট—হর্‌লে, পীলো-হর্লে; হর্দী, হিমগিহীরা।
তামিল—কড়কৈ।
তেলেগু—করক, কড়কর, করকু।
কণাড়ী—হীর্দা, অলালে-কায়ী, অলালে-পিণ্ড।
মলয়—কটুক।
ব্রহ্মদেশে—পাঙ্গা।
সিংহলদ্বীপে—আয়ালু, আর্লু।
আববদেশে—হলীডাজ্।
পারস্যদেশে—হলীলাই, হলিলাহে, জঁব্রদ।
চীনদেশে—হোলিলে, হোংজে।
ইংলণ্ডে—Myrobulan
ইটালী—Chebulic

(ক্রমশঃ)

# বিবিধ।

## (সম্পাদক)।

(বিনা পণে কিম্বা, যে যে স্থানে পণ লইয়া বিবাহ হয় তৎসম্বন্ধে সংবাদাদি প্রেরণ জন্য আমরা পাঠক মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি)।

### (ক) উপনয়ন :—

১। বিগত ৩১শে বৈশাখ ফরিদপুর জিলান্তর্গত শৈলডুবী গ্রামে ৺ হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হয়। উক্ত কেন্দ্রে ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের তত্ত্বাবধকতায় নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন ;—শৈলডুবী নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন দত্ত, সুরেশচন্দ্র দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী। চেউখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সরকার। বিনকদীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়। কুমারদীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু। শোলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেব। মাক্রষা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীতীশচন্দ্র বাহুত।

### (খ) অন্যান্য :—

১। আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত পাঠকগণ সমীপে নিম্নলিখিত সুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।—গত ৫ই জুন, (২২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার) ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যে সমস্ত মহোদয়গণ উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩ জন কায়স্থ মহাত্মার নাম দৃষ্ট হইতেছে।—

(ক) দিনাজপুরের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর মহোদয়,—"মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

(খ) মাদারীপুরের (ফরিদপুর) উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি,এল ও শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ বি, এল উভয়েই 'রায়-সাহেব' উপাধি লাভ করিলেন।

যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা আদৃত হইয়াছে, ইহা অতীব সুখের বিষয়।

---

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

১। "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ২৲ মাত্র; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু বৈশাখ সংখ্যা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন কারণে কাগজ না পান তাহা সময়ে না জানাইলে পরে মূল্য দিয়া কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

২। পত্রের উত্তর জন্য রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা।

---

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg No. C. 653

# আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ ]　　　　　　　　　　[ ৩য় সংখ্যা।

আষাঢ়—১৩২৭ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲।　　　　　　প্রতি সংখ্যা—৵০।

# সূচীপত্র।

( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী )

# আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। { আষাঢ়, ১৩২৭ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

## জীবন কি অনুভূতি?

( শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত )।

[illegible] মাতৃগর্ভে যখন মুদিত নেত্রে শায়িত ছিলাম, তখন আমাতে কি ছিল? স্মৃতি না বিস্মৃতি—সুখ না দুঃখ? কি সে অবস্থা?—নিদ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা জাগরণ? দেহ যখন নাড়ীজাল বিধৃত হইয়া জননীর অঙ্গে মিলিত ছিল, মন তখন কি নিগূঢ় সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বনে কোন্ রহস্যময় ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, কে বলিতে পারে?

তার পর জননী-দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে দিন বসুন্ধরা বক্ষে আশ্রয় লইলাম, সে দিন কোন ইন্দ্রজালিকের মোহন তূলিকা আমার উন্মেষোন্মুখ নয়নের সম্মুখে এই জাগ্রত জগৎ-স্বপ্ন প্রকটিত করিয়া দিল। ওগো, সে স্মৃতি কি তোমাদের আছে? জীবনের সে প্রথম স্বপ্ন তোমাদের মনে পড়ে কি? সেই রুদ্ধদ্বার সূতিকাগৃহ,—সূতিকা গৃহের সে নিষ্কম্প ক্ষীণ দীপশিখা,—সেই ম্লানালোকে উদ্ভাসিত জননীর স্নেহ করুণ মুখচ্ছবি—তাঁর অঙ্গের সে আকুলস্পর্শ—বক্ষের পীযূষ ধারার সে [illegible] মধুরতা, কণ্ঠের সোহাগ বাণীর সে ললিত ঝঙ্কার,—সে সব কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? এ জীবন-গ্রন্থের সেই প্রথম বর্ণমালা কি তোমাদের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে? হায় মুগ্ধ! হায় অন্ধ! হায় একান্ত-বর্ত্তমান-মগ্ন! তুমি তাহা ভুল নাই—তুমি তাহা ভুলিতে পার নাই। সে স্মৃতি তোমাময় হইয়া আছে—অহোরাত্র তোমার শোণিত

প্রবাহের সহিত তোমার প্রতি অনুভূতির মধ্যে, সে নিরবে বিচরণ করিতেছে; বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষের অন্তরালে তাহার মৌন ধ্যানস্থ মূর্ত্তিটী তুমি দেখিতে পাইতেছ না মাত্র। অতি সন্তর্পণে, বড় মৃদু,বড় কোমল চরণে সে আসিয়াছিল, তাই তোমার হৃদয়ে তাহার পদাঙ্ক গভীর রূপে মুদ্রিত হইতে পারে নাই; ভগবানের আলোক ও বাতাসের ন্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আগমন,তাই সে তোমাকে উদ্বিগ্ন বা সন্ত্রস্ত করে নাই,—আর তাই বুঝি সে এত অনাদৃত! তোমার নয়নে উষার আলোক, নেত্র পল্লব প্রান্তে শিশির বিন্দু, অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা আঁকিয়া দিয়া সে নিবিড় ছায়াতলে চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুতিকাগার হইতে শয়ন গৃহ—শয়ন গৃহ হইতে পরিজনগণের অঙ্কে অঙ্কে কত দিন অতিবাহিত হইয়াছে। হাসিতে—অশ্রুতে, মেঘে—রৌদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া ক্রমে শিশুদেহে ক্রিয়া চাঞ্চল্য ও ভাষার অভিব্যক্তি আসিতেছিল। এ নগ্ন শিশুর আরক্ত পদতলের পেলব স্পর্শ লাভের জন্য বসুধা বক্ষ বুঝি লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল! এই প্রকম্পিত অধর পুটের পদ গদ ভাষাটুকুর জন্য ধরণী বুঝি আগ্রহে শ্রবণময় হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল! এই সদানন্দ ভোলানাথের দর্শন লাভের জন্য ধরণী বুঝি এত কাল হিমালয়-দুহিতা উমার মত তপমগ্না হইয়াছিল! এ রসনায় কি জগতের সকল রসাস্বাদ, এ নাসিকায় কি জগতের সকল গন্ধানুভূতি, এ তরুণ নয়নে কি নিখিলের সকল সৌন্দর্য্য রাশি লুক্কায়িত ছিল! আমার দৃষ্টি সম্পাতেই কি প্রকৃতি অঙ্গে প্রেমের পুলকে রূপের কমল ফুটিয়া উঠে? এই দুইটী কৃষ্ণ আঁখি-তারকায় প্রতিবিম্বিত না হইলেই কি প্রকৃতির রূপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়? এ চিত্ত-মুকুরেই বুঝি প্রকৃতি আপনার মুখচ্ছবি দেখিয়া লয় গো। এই লীলাকাননেই বুঝি পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির মিলন হয়! এই বুঝি সেই চির-মিথুন,—সেই যুগল রাধা-শ্যামের মাধবী কুঞ্জ গো! এই কাননের লতায় পাতায়—এ বনের পাখীর ডাকে—এই তমালের শ্যামল ছায়ায়—এই কদম্বের পুলক শিহরণে—এই যমুনার কাল জলে—এই গন্ধে আকুল মলয় হাওয়ায়, নিত্য কত নব নব লীলা রঙ্গ চলিতেছে—তোমরা কি কেহ তাহা অনুভব করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তবেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে। এ খেলা ত

কত কাল চলিয়াছে—এ যে অফুরন্ত উৎসব—এ যে চির লক্ষ্মী পূর্ণিমা গো! যদি কোজাগরে নিশা যাপন করিয়া থাক—তবেই ত তার দেখা পাইয়াছ; যদি উৎকর্ণ হইয়া এ রজনী অপেক্ষায় কাটাইয়া থাক—তবেই ত নিশি শেষে তার পায়ের সাড়া শুনিতে পাইয়াছ;—কোথায় অলক্ষ্যে কখন যেন কার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়া আইসে,—কে যেন আড়ালে থাকিয়া তার মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া এ অঙ্গ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়,—কে যেন স্বপ্নের মত, অতীত স্মৃতির মত, সময় সময় আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—তোমরা কি তাহাকে চিন গো?

যাক,—যে কথা বলিতেছিলাম;—ঐ যে যখন আমি শিশু ছিলাম,—তখন কোথায় ছিল—এ আত্মপর ভেদ জ্ঞান, আর কেই বা জানিত এ বণিক-বৃত্তি সংসারের লাভালাভের গণনা? তখনও আমাতে "তুমি"র জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই—তখনও তোমায় আমায় বিরোধ বাধে নাই, তাই তখনও বৈকুণ্ঠ রাজ্য দেখিতে পাইতাম; আমায় দেখিয়া সকলের সকল কুণ্ঠা টুটিয়া যাইত। আমাকে কোলে লইতে দিগাঙ্গনাগণ ধাইয়া আসিত,—আমার কপালে সোনার টিপ আঁকিয়া দিতে—আকাশে চাঁদের মন আকুল হইয়া উঠিত,—আমার কুঞ্চিত কেশ কলাপ স্পর্শ করিতে মলয়ের হাওয়া পাগল হইত,—আমায় চুম্বন করিয়া জগতের নর-নারী স্বর্গসুখ অনুভব করিত। আমার প্রতি অঙ্গে প্রভাত নলিনীর তরুণতা, আমার প্রতি অশ্রু বিন্দুতে শিশির মুকুতার স্বচ্ছ পবিত্রতা, আমার কম কণ্ঠস্বরে মন্দাকিনীর কল কল ধ্বনি, আমার মুখে উষারুণের হেম-জ্যোতি রেখা, আমার নিশ্বাসে মন্দার রেণুর সুবাস মিশ্রিত ছিল। সন্ধ্যার নিবিড় কৃষ্ণচ্ছায়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রাভরে আমার নয়ন-পল্লব মুদিত করিয়া দিত, আবার প্রভাতের অরুণালোকে বিহঙ্গের প্রথম গানে আমি জাগিয়া উঠিতাম। ওগো, আকাশের গায় সোনালী মেঘের মত আমার জীবনের সে সর্ব্বোত্তম স্মৃতি আলেখ্য খানা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, তোমরা বলিতে পার কি?

তার পর, বহির্জগতের প্রবল আকর্ষণ।—জননীর অঙ্ক আর আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমার দুরন্ত মন যে কত দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়—ক্রীড়া-প্রাঙ্গনে কি মোহন বেণু বাজিয়া উঠে—পাখীর গানে কি মাদকতা

আনয়ন করে—সমবয়স্কগণের কল হাস্য-ধ্বনিতে কি যেন কেমন মাধুরিমা প্রচ্ছন্ন আছে।—আমি চাই ছুটিয়া যাইতে—মাতা চাহেন অঞ্চলে ঘিরিয়া রাখিতে,—আমি যখন চঞ্চল হইয়া উঠি—জননী তখন ঘুম পাড়ান গানে আমায় শান্ত করিতে চাহেন,—যখন এ বাল গোপাল অবাধ্য হয়—তখনি যশোদা মাতা তাহাকে বন্ধন করিতে গিয়া ব্যর্থ প্রয়াসে পরিশ্রান্তা হন,—আমি বদন-বিবরে বিশ্ব-সৃষ্টির আভাস দেখাইয়া জননীকে ভুলাইয়া চলিয়া যাই।

দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় এ দেহ বর্দ্ধিত এবং কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। ক্রীড়া-প্রাঙ্গন ছাড়িয়া প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে মন আমার ছুটিয়া চলিল। কোথায় কোন্ মাঠের বুকে শ্যামলতার ঢেউ খেলিয়া যায়, কোথায় কোন্ সর্ষপ-ক্ষেত্র সোনার স্বপন রচনা করে, কোথায় কোন বনের ধারে ঘুঘুর ডাকে, ঝিল্লী-রবে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়,—কোথায় কোন্ তটিনীর স্বচ্ছ জলে তীরস্থিত বৃক্ষছায়ায় ধ্যানমগ্ন যোগী-হৃদয়ের শান্ত ছবি ফুটাইয়া তুলে;—আবার কোথায় কোন বাগানে কি ফল পাকে, কোন লতিকায় কি ফুল ফোটে,—পরাগ-মণ্ডিতদেহ মক্ষিকার দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেন অমন গুণ গুণ করে,—কি আনন্দে চিত্রিত-পক্ষ পতঙ্গ সকল বায়ু-তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করে। এমনই করিয়া মন কোথায় উধাও হইতে চায়, এমনই করিয়া বুঝি রূপের সাগরে সাঁতার দিতে সাধ যায়!

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাস্রোত প্রখর হইয়া আসিল—প্রকৃতির সহিত পরিচয় ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। নিম্নে সলিল বিপুলা শৈল-কানন শোভিনা বর্ণ-গন্ধ গীতিময়ী শ্যামা ধরিত্রী দিনে দিনে, পলে পলে, অনুভূতি পরম্পরায় আমাকে ব্যাকুল আগ্রহে, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তন্ময় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। উর্দ্ধে সীমাহীন গগণের নিবিড় নীলিমা,—নীলিমার বুকে তরঙ্গায়িত মেঘ শীর্ষে মুহুর্মুহু বিবিধ বর্ণমালার বিচিত্র সংমিশ্রন, ক্ষণপ্রভার চকিত দীপ্তি এবং তদূর্দ্ধে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী ও নিহারিকা পুঞ্জের আলোক-স্পন্দন আমার মুগ্ধ কৌতূহলী চিত্তকে ইঙ্গিতে ছায়াপথ দিয়া অসীমের পানে আহ্বান করিতেছিল। এক দিকে সসীমের পরিমিত আনন্দ, অপর দিকে অসীমের বিরাট উন্মাদনা। সসীম অনতিক্রম্য—অসীম

অনধিগম্য। মন সসীমকে উপভোগ করে বটে—কিন্তু তাহার গতি নিরন্তর ঐ অসীমের পানে। ওগো সসীম! ওগো সুন্দর! তুমি কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে,কত ছন্দে,কত নিবিড় স্পর্শ রসে আমায় মুগ্ধ করিতে চাও,—তাই বুঝি তোমাতে আমার প্রবৃত্তি! আমি তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া,—তোমার গানে কান পাতিয়া,—তোমার স্পর্শ-রসে ডুবিয়া গিয়া—তোমাতেই লীন হইতে চাই,—কিন্তু এ কি এ? তোমার রূপের মদিরায় এ কি আবেশ স্বপ্ন আনয়ন করে, তোমার গানে এ কি বিরহ-রাগিণী বাজিয়া উঠে, তোমার স্পর্শ-রসে এ কি অসহ্য পুলকের সঞ্চার হয়! আমি বড় সাধে তোমাকে বুকে লইয়া তোমার ভাবে বিভোর হইতে চাই—কিন্তু সাধ ত পূর্ণ হয় না,—তৃষ্ণা তো মিটে না। তোমার আলিঙ্গনের প্রগাঢ়তার মধ্যে আমি যে তোমার সত্তা হারাইয়া ফেলি,—তোমার অনুভূতি যে তোমাকে অতিক্রম করিয়া—সীমার বন্ধন ছিঁড়িয়া—অসীমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে? আমি বুঝিয়াছি,—ওগো রূপ! তুমি প্রতিমা—দেবতা তোমার পেছনে, তুমি জড়—চেতনা তোমার অন্তরে। সেই আলোকের আভা বুঝি তোমার মুখে ডিয়াছে—তাই তুপিম এত সুন্দর। তুমি বুঝি তাঁর বার্ত্তাবহ,—আমারি যাত্রা বুঝি অরূপের দেশে।

এই ভাবে প্রথম যৌবনে—জীবন কুঞ্জে পুষ্পে পুষ্পে যখন আমি রূপের ভাষা পড়িতেছিলাম, সসীমের তটান্তে দাঁড়াইয়া যখন আমি অসীমের জল কল্লোল শুনিতেছিলাম—কল্পনা যখন ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, দৃষ্টি যখন দূরে—অতি দূরে—আরও দূরে গিয়া প্রহত হইতেছিল,—সেই সময়ে সীমা ও অসীমার মিলন রেখায় অই কে আসিয়া দাঁড়াইল? কে তুমি সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু—নয়নে অনন্তের দীর্ঘ ইতিহাস—বদনে গভীর শান্তি, অধরে কৌমুদী ধারা—হৃদয়ে প্রেম—হস্তে সুধাভাণ্ড লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলে? এস এস—অসীমের দিক্-বালিকা! সসীমের রূপ প্রতিমা! এস তুমি; এ বাহুর বন্ধনে ধরা দাও। ওগো মায়াকাননের হেম মৃগ, আকাশের ইন্দ্রধনু, তটিনী বুকের লহরী লীলা, তোমায় আমি অনেক খুঁজিয়াছি—কখনও ত তুমি ধরা দেও নাই! জীবন মন্দিরে রূপের বাতি ত সেই প্রথম দিন হইতেই জ্বলিতেছে, কিন্তু তুমি ত শুধু রূপ নহ!

আজ বুঝি সেখানে প্রাণের আরতি আরম্ভ হইয়াছে—তাই আমার রূপের ক্ষুধা মিটাইয়া দিতে, আমার অরূপের স্বপ্ন সফল করিতে, একাধারে—বর্ণ গন্ধ-গীতি-স্পর্শ-রসময়ী ঐ কায়ার ভিতর অতনু দেবতার অনন্ত প্রাণ লইয়া আমার সকল সাধ পূর্ণ করিতে তুমি আসিয়াছ! এস প্রিয়ে—এস প্রিয়তমে! এ দেহের প্রতি পরমাণু যে তোমায় আহ্বান করিতেছে, এ জীবন-বিহঙ্গ যে তার অনন্ত পথের সঙ্গীটীর জন্য বহু দিন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আছে। এস, এ তরুর মাধবী বল্লরী! এস এ বক্ষের কল্পলতিকা! নিবিড় আলিঙ্গনে অধীর চুম্বনে আমাকে ছাইয়া দাও। আমার চিরজীবনের রূপের সাধ, আমার স্পর্শ রসের যত ব্যাকুলতা তোমার মধ্যে বিরাম লাভ করুক। দেহের মিলনে—দৈহিক স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাউক—আমি বাহিরের চক্ষু মুদিয়া, ওগো অন্তরময়ি! তোমার চেতনাময়ী পরা-প্রকৃতিতে অন্তরের চক্ষু লগ্ন করিয়া রাখি। একি অভিনব জাগরণ! জীবনের একি তীব্রতর অনুভূতি! কি ছার বাহিরের রূপ—দুদিনে ঝরিয়া পড়ে,—চক্ষের পলক না ফিরিতে মলিন হইয়া যায়! বৃথাই সে দেহের মিলন—সেই ক্ষুধিত রক্ত-মাংশের উৎকট আত্মদ্রোহ যাহা হোমাগ্নির মত জীবনকে পবিত্র করে না—দাবাগ্নির মত মানব পশুকে দগ্ধ করিয়া মারে। বিফল সে পরিণয়, যাহাতে জড়দেহের পূজা হয়—অন্তরের দেবতা উপবাসী থাকেন।

যৌবনের স্বপ্নময় পথ দিয়া আজ যে কর্ম্ম-কঠোর ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—এখানে কল্পনার স্থান বড় অল্প। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে দিগ্বলয় গৈরিক ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন, প্রতপ্ত মারুত স্পর্শে কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক, নাসাপথে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে। অভাব দারিদ্র্যের রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে কল্পনা-বিহঙ্গম ভয়ে পক্ষপুটের অন্তরালে আপনাকে অবগুণ্ঠিত করিতেছে—কখনও বা পরিত্রাহি রবে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিতেছে। সংসারের বৈষম্য, দাম্ভিকের অভ্যুত্থান, শাঠ্য ও প্রবঞ্চনার অসম্ভব প্রাধান্য, সত্য ও সারল্যের অবমাননা, স্বার্থ সেবা ও ভোগের সম্বর্দ্ধনা, ত্যাগ ও নিস্বার্থ-পরতায় উপহাস এবং ছলে বলে কৌশলে রৌপ্য-কাঞ্চন সংগ্রহ ক্ষমতায় বুদ্ধিমত্তার আরোপ দর্শনে হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি সকল মাঝে মাঝে ক্রন্দন

করিয়া উঠিতেছে,—মন বিভ্রান্ত ও সন্দেহাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বুভুক্ষিতের মুখের গ্রাস লইয়া বিলাসীগণের পালিত সারমেয় কুল পরিপুষ্ট হইতেছে,--অনাথা বিধবার অশ্রুসিক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দাম্ভিকের অভ্রভেদী অট্টালিকা উত্থিত হইয়া দারিদ্র্যের প্রতি কঠোর বিদ্রূপ করিতেছে—সমাজের ঔদাসীন্যে কত সোনার কমল শুকাইয়া গেল—মানুষের নিষ্ঠুরতায় কত প্রতিভার মুকুল ঝরিয়া পড়িল। এই কি সৃষ্টি! এই কি মঙ্গলময়ের রচনা!--অসীম করুণা বারিধির প্রশান্ত বুকে একি উৎকট ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে! অথবা নয়নের সম্মুখে ভাসমান এ দৃশ্যাবলী সকলই স্বপ্ন? দেশ-হীন, কাল-হীন সে প্রশান্ত বারিধিবক্ষ চিরদিন অচঞ্চল স্থির রহিয়াছে, বিন্দুমাত্রও সংক্ষুব্ধ হইতেছে না। শুধু কালবদ্ধ বর্ত্তমান যবনিকার উপর মুহুর্মুহু এই ক্ষণভঙ্গুর উর্ম্মিরাশি প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। সৃষ্টির বিবর্ত্তনে এ প্রতীতির আবশ্যক আছে;—থাক্ নিষ্ঠুরতা, চলুক ধ্বংসলীলা, নাচুক প্রভঞ্জন বেগে প্রমত্ত উর্ম্মির দল—উহারা ঐশী সৃজন লীলার এক মহান্ প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত আছে। আপনার ক্ষণিক অস্তিত্বের প্রয়োজন সাধন করিয়া উহারা আপন উন্মত্ততায় আপনাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কে উঠে—কে পড়ে—কে ভাঙ্গে—কে গড়ে—তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না; সব যায়—থাকে শুধু প্রতীতি। রূপ-ভানু অস্তাচলে ডুবিয়া যায়—মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্ব হাসিতে থাকে,—কত আসে—কত যায়,—থাকে শুধু অনুভূতি। এ উর্ম্মি বিক্ষোভ—সংগ্রাম নহে, এ ধ্বংসলীলা;—নিষ্ঠুর আঘাত নহে, জীবনে তীব্রতর অনুভূতি আনয়নের জন্য রহস্যময়ী প্রকৃতির এ কৌশল জাল বিস্তারমাত্র। এই যে হাসিটী অধর প্রান্তে মিলিয়া গেল—ঐ যে অশ্রুবিন্দু গণ্ড বহিয়া ভূতলে পতিত হইল—ঐ যে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল, উহারা কেহই অর্থহীন নহে; উহারাই আমাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যাহা ছিলাম—যাহা হইয়াছি—যাহা হইব,—সকলেরই মূলে ঐ হাসি অশ্রুর প্রভাব। ঐ সুখ দুঃখের তরঙ্গাভিঘাতেই আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীর নিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে। জীবন ত অনুভূতির সমষ্টি। জগতের অস্তিত্বই ত যে ঐ প্রতীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—"প্রতীতিমাত্র বিভাতি ইদং বিশ্বচরাচরং।" জীবন পথে এপর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই আমি পাই নাই, পাইবার আশাও করি না। অন্তর্দৃষ্টি যতদূর

যায়, এক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। আজ জীবন মধ্যাহ্নে চারি পাশে পুত্রকন্যারূপে এই যে স্নেহের মুকুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহাদের মধ্যেও আমি পাইতেছি—শুধু প্রাণের স্পন্দন, স্নেহের অনুভূতি। নিরাশার দহনে—বিয়োগের দুঃখে—অভাবের তাড়নায়—বিপদের বিভীষিকায়—উৎসবে—প্রমোদে—ঐ অনুভূতি টুকু মাত্র আমার প্রাপ্য। কবির কাব্যে, শিল্পীর চিত্রে, ভোগীর সম্ভোগে, যোগীর ধ্যানানন্দে, ত্যাগীর ত্যাগ ব্রতে,—অহংকারীগণের আত্মপ্রতিষ্ঠায় এবং আত্মারামগণের আত্মরতিতে—সর্ব্বত্র এই অনুভূতি নিত্য বিরাজমান। কত জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কতবার আসিয়াছি, কতবার দেহ বিলীন হইয়াছে জানি না—কিন্তু মনে হয়, এই অনুভূতিই আমাকে রূপ হইতে রূপান্তরে পুনঃ পুনঃ বিবর্ত্তিত করিয়া আনিয়াছে—এ গতায়তির বিশ্রাম কোথায়—কে জানে। বলিতে পার কি—কত দূরে—কত দিনে—এই মহাযাত্রার চির বিরাম?

সম্মুখে জীবনের অপরাহ্ন—তারপর সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়া—তার পর বুঝি মৃত্যুর নিবিড় যবনিকা। এ অপরাহ্ন কি ছায়াময় হইবে? এ অপরাহ্নে কি বাসনা বহ্নির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিবে? স্নেহ মন্দাকিনী-তীরে করুণার উৎস-কূলে, শান্তি পাদপের প্রগাঢ় ছায়াতলে বসিয়া জীবন-বিহঙ্গ বুঝি একান্তে আপনার আহরিত অনুভূতি ফলগুলির অমৃত আস্বাদনে নিরত থাকিবে;—তার পর ধীরে ধীরে মৃদু চরণে সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে। এ সন্ধ্যা কি তেমনই শান্ত, তেমনই নিরব, তেমনই সুমহান্, তেমনই গম্ভীর ভাবোদ্দীপক হইবে? জীবন সঞ্চিত অনুভূতি নিচয় ভাবঘন মূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে আমার পরম দেবতার পাদপীঠ রচনা করিয়া দিবে কি? সান্ধ্য-কুসুম কি ফুটীবে? আরতি ঘণ্টা কি বাজিবে? ধূপ গুগ্‌গুল গন্ধে আমার অন্তরের ব্যাকুলতা কি সন্ধ্যার নিস্তব্ধ, অসীম গগণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে? তার পর বুঝি ঐ গোধূলির ম্লানালোক নিবিড় তিমিরে ডুবিয়া যাইবে,—ভারাহীন আত্মানুভূতির প্রশান্ত জলধিবক্ষে বুঝি এ ক্ষুদ্র দ্বৈতানুভূতি বুদবুদ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কি অসীম, কি অগাধ, কি নিবিড় সে মহা মিলন!

# বঙ্গদেশে ব্রিটীশ রাজ্য স্থাপনের সমকালে সোম বংশীয় কায়স্থের প্রভাব।

( শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ )।

অতি প্রাচীন কালে সেই বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্রাদি প্রকাশ অথবা প্রচারের সময়ে, অথবা দূর-বিস্মৃত রামায়ণ-মহাভারতাদি মহাকাব্যের বর্ণিত যুগে, এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিরূপণ এবং প্রকাশ করার কথা দূরে থাকুক, আমরা অনেকেই আমাদের দেশের সেই দিনের অর্থাৎ দেড় কি দুই শত বৎসরের ইতিহাসও কিছুমাত্র জানি না; অধিক কি, পলাশীর যুদ্ধেরও প্রকৃত বিবরণ অনেকেরই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। কবিবর ৺নবীন-চন্দ্র সেন প্রথম যৌবনে "পলাশীর যুদ্ধ" নামক খণ্ড কাব্যে এই সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কাব্যে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এখনও কোন উৎসাহী সাহিত্যিক অথবা ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে যে বিষম রাজনৈতিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল,—মুসলমান, মারাঠা ও মার্চ্চেণ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষ প্রযুক্ত উপর্য্যুপরি যে সকল ঘটনা নিত্য সঙ্ঘটিত হইতেছিল, সেই সময়ে প্রায় এক শতাব্দ কাল যাবৎ, বঙ্গদেশের অনেকগুলি কায়স্থ-পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আজ আমরা একটী মাত্র পরিবার সম্বন্ধে সামান্য রূপ আলোচনা করিতেছি।

কলিকাতা নগরের বাগবাজার অংশে "রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট" নামক একটী পথ আছে। এই পথের নাম যে রাজবল্লভের নামানুসারে করা হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য বংশীয় রাজা রাজবল্লভ নহেন, পরন্তু কায়স্থ সোম বংশীয়

ছিলেন। এই পরিবার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার,—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নাম সকলেই জানেন; কিন্তু তিনি চিরকালই "নবাব" অথবা "আলীবর্দ্দী খাঁ" ছিলেন না; জীবনের প্রথম ভাগে তিনি এক দরিদ্র মুসলমান ভদ্রলোকের পুত্র—"মীর্জ্জা মহম্মদ আলী" নামেই পরিচিত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব ছিলেন এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা প্রদেশের নায়েব-সুবাদার (সহকারী-গভর্ণর) ছিলেন। সুজাউদ্দীনের আদিম বাসস্থান পারস্যের খোরাসান প্রদেশে ছিল এবং তিনি তুর্কী বংশীয় ছিলেন। সুজাউদ্দীনের এক সুজাতিয়া-আত্মীয়ার স্বামী মীর্জ্জা মহম্মদ নামক এক ভদ্র মুসলমান, জীবিকার জন্য উড়িষ্যায় গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সুপারিশে, নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দীনের অধীনতায় চাকুরী করিতে থাকেন। এই মীর্জ্জা মহম্মদেরই কনিষ্ঠ পুত্র "মীর্জ্জা মহম্মদ আলী"—উত্তর কালে "আলীবর্দ্দী খাঁ" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদার সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহের ফলে মীর্জ্জা মহম্মদ আলী (আলীবর্দ্দী খাঁ) "অম্বরেশ্বর" নামক একটি পরগণার তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। সেই সময়ে কোন্নগর গ্রামের (বর্ত্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বিখ্যাত গ্রাম) সোম বংশীয় জানকী-রাম নামক এক উৎসাহী যুবক চাকুরীর অনুসন্ধানে উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। এই জানকীরাম, অম্বরেশ্বরের তহশীলদার মীর্জ্জা মহম্মদের পেস্কার হইলেন এবং কার্য্যদক্ষতায় ক্রমশঃ তিনি তহশীলদারের অতিশয় প্রিয়পাত্র, এমন কি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা হইতে আসিয়া বাঙ্গলার মসনদে বসিলেন ও তাঁহার আত্মীয়ার স্বামী মীর্জ্জা মহম্মদকে কাটোয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। পেস্কার অথবা মুন্সী জানকীরামও মীর্জ্জা সাহেবের সঙ্গে আসিলেন। মীর্জ্জা-সাহেবের উত্তরোত্তর সৌভাগ্যোদয়ের সহিত মুন্সী জানকীরামেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মীর্জ্জা সাহেবের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল, দিল্লীর বাদশাহ বিহার প্রদেশকে বাঙ্গলার নবাবের অধীন করিয়া দিলেন এবং নবাব সুজাউদ্দীনের কৃপায় মীর্জ্জা সাহেব বিহার-সুবার নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। পেস্কার জানকীরামও এইবার বিহার প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদ,—দেওয়ানী পাইয়া প্রভুর সহিত পাটনায় গেলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হইলেন; কিন্তু এই উচ্চপদই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

সরফরাজ খাঁ নবাব হইলেন বটে, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের এবং কর্ম্মচারীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না, তজ্জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে হাজী আহম্মদ, রায় রায়া আলমচাঁদ, জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত বিহারের নায়েব সুবাদার মীর্জ্জা মহম্মদের যোগাযোগে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। দিল্লীর বাদশাহের দরবারে রীতিমত তদ্বির করাইয়া মীর্জ্জা সাহেব নিজের নামে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীর এক সনন্দ আনাইয়া সসৈন্যে ধুমধামের সহিত মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। লোকে ব'লে, এই বাদসাহী সনন্দ খানি প্রকৃত নহে, পরন্তু জাল। যে সুজাউদ্দীনের কৃপায় মীর্জ্জা মহম্মদ বেকার ও দরিদ্র দশা হইতে বিহারের সুবাদার হইয়াছিলেন, রাজ্যের লোভে আজ তিনি সেই প্রভু-পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ দেওয়ান জানকীরাম এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা এবং পরিচালক হইলেন।

সংসারে যোগ্যতমের জয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। অলস ও অকর্ম্মণ্য সরফরাজ খাঁ "গড়িয়া" ক্ষেত্রে পরাস্ত ও নিহত হইলেন এবং মীর্জ্জা মহম্মদ আলী বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাব হইয়াই তিনি "আলীবর্দ্দী খাঁ মহব্বত জঙ্গ" এই উপাধি লইলেন এবং এই নামেই তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছিলেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ সুবে বাঙ্গলার নবাব হইয়া জানকীরামকে বাঙ্গলা বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা অর্থাৎ দেওয়ান করিলেন, কেবল

দেওয়ানী নহে, জানকীরাম মুর্শিদাবাদ নেজামতের সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা হইলেন।

এইবার সেই সর্ব্বজন ভয়ঙ্কর বর্গীর হাঙ্গামার কথা।—১৭২০ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদিগের সহিত বাদসাহ চৌথ দিবার যে চুক্তি করিয়াছিলেন, এত দিনেও সেই দেনা পরিশোধ না হওয়ায়, তাঁহারা ব্যাঘ্রের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন; আলীবর্দ্দী খাঁ সনন্দ না পাইয়াও গায়ের জোরে সুবে বাঙ্গলার মসনদ অধিকার করায় বাদশাহ "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" করিবার উদ্দেশ্যে মারাঠাদিগকে সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ দেখাইয়া চৌথ আদায় করিতে বলিলেন। মারাঠাগণ একেই ত বাঙ্গলা লুঠ করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন,—তাহার উপর বাদশাহের আদেশ অথবা ইঙ্গিত পাইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া নূতন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেওয়ান জানকীরাম তাঁহার এই বিপদে কাণ্ডারী স্বরূপ হইলেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—এবং "Every thing is fair in love and war"—প্রভৃতি শাস্ত্র নীতির সুনিপুণ শিষ্য জানকীরাম সোম, চতুর-চূড়ামণি চাণক্য-শিষ্য শিবাজীকেও অতিক্রম করিলেন। তিনি প্রভু আলীবর্দ্দীকে এরূপ মন্ত্রণা দিলেন, যাহার ফলে মানকর (বর্দ্ধমান জেলায়) গ্রামের ছাউনীতে মারাঠা-সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইল। স্বয়ং জানকীরাম ভাস্কর পণ্ডিতের তাঁবুতে গিয়া সহাস্য আস্যে ও সুমিষ্ট ভাষায় প্রণতি সহকারে তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার সমস্ত সেনা-নায়ক ও কতিপয় অতি সাহসী সেনানীর সহিত অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মানকরে নবাবের দরবারে আসিয়া মৃগয়া-ক্ষেত্রে হস্তিশ্রেণী-মধ্যে আবদ্ধ বন্য মহিষ যূথের ন্যায় নির্ম্মম ভাবে নিহত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের উষ্ণীষ-শোভিত মস্তক আলীবর্দ্দী খাঁর চরণোপান্তে স্থাপিত হইল এবং নেতৃহীন মারাঠা-সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিল। জানকীরামের বুদ্ধি-কৌশলে নবাব দুর্দ্দান্ত শত্রুর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, প্রথমে তাঁহাকে "দেওয়ান-ই-তন্" ও অল্প কাল পরে সমর বিভাগের প্রধান দেওয়ানের পদে (Comptroller General of Armies) নিযুক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন।

এইবার নূতন আর এক অঙ্ক আরম্ভ হইল।—আলীবর্দ্দী খাঁ সুবে বাঙ্গলার নবাব হইবার পরই, নিজ কনিষ্ঠ জামাতা জৈনউদ্দীন-আহম্মদ খাঁকে (সিরাজদ্দৌলার পিতা) বিহারের নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে কতিপয় দুর্দ্দান্ত পাঠান সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জৈনউদ্দিন প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বিহারের সুবেদারী এই প্রকারে শূন্য হইলে, নবাব তাঁহার মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সৈয়দ আহম্মদ নিজ পদ সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বতন নবাব সরফরাজ খাঁর আশ্রিত (এবং আলীবর্দ্দী খাঁর তাড়িত) কয়েকজন বীর ও সাহসী মুসলমান সর্দ্দারকে আপনার দরবারে আনয়ন করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আলীবর্দ্দী খাঁর বেগম, জামাতা সৈয়দ আহম্মদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ কৌশলে সৈয়দ আহম্মকে সরাইয়া প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে (তাঁহার পৈত্রিক পদ—এই দাবীতে) বিহারের সুবেদারী দিবার ব্যবস্থা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা এই সময় নিতান্ত তরুণ বয়স্ক ছিলেন সুতরাং তাঁহাকে নামমাত্র বিহারের নবাবী দিয়া আলীবর্দ্দী তাঁহার মিত্র জানকীরামকে প্রকৃত সুবাদার করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। জানকীরাম নামে নায়েব অথবা সহকারী সুবাদার হইলেও তিনিই বাস্তবিক বিহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

জানকীরাম বিহারের নায়েব-সুবাদার হইয়া কেবল নবাব আলীবর্দ্দীরই যে বিলক্ষণ সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন, এমত নহে; তিনি দিল্লীর বাদশাহ-দরবারেও নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। দিল্লীর বাদশাহের ওমরাহগণের মধ্যে অনেকেরই বিহার প্রদেশে জায়গীর ছিল; কিন্তু এত দিন কোন সুবেদারই তাঁহাদের প্রাপ্য মুনাফা নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেন না। সুচতুর জানকীরাম মানব-চরিত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন; তাই তিনি ওমরাহগণের নিকট তাঁহাদের প্রাপ্য মুনাফা নিয়মিত ভাবে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন। ঘরে বসিয়া এরূপ ভাবে অর্থ পাইলে কে না সন্তুষ্ট হয়? ওমরাহগণ জানকী-রামের প্রতি খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার ফলে অল্পকালের মধ্যেই বাদশাহের দরবার হইতে—"মহারাজ বাহাদুর" খেতাব, "পঞ্চহাজারী

মনসবদারী" ও ঝালদার পাল্‌কী, নহবৎ, কলস, সমসের, ঢাল ও চামর ব্যবহারের অনুমতি প্রভৃতি অনুগ্রহ বর্ষার বারিধারার ন্যায় তাঁহার মস্তকে অজস্র পড়িতে লাগিল। মুন্সী জানকীরাম সোম এত দিনে "মহারাজ জানকীরাম সোম ষষ্‌হাজারী মনসবদার নায়েব সুবেদার বাহাদুর" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ জানকীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্লভরাম প্রথম হইতেই নবাব আলীবর্দ্দীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। জানকীরামের কৌশলে "বর্গীর হাঙ্গামা" নিবারিত হইলে,নবাব আলীবর্দ্দী দুর্লভরামকে উড়িষ্যার সুবেদারী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু চতুর-চূড়ামণি পিতার উপযুক্ত পুত্র দুর্লভ তখন সেই উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই; কারণ, সেই সময়ে নবাবের অন্যতম প্রিয়পাত্র আবদুস্ শোভান সেই পদের প্রার্থী ছিলেন। আবদুস্ শোভানই সেইজন্য উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া গেলেন কিন্তু তিনি দুর্লভ রামকে নিজের দেওয়ান করিলেন। অল্পকাল পরে আবদুস্ শোভানের মৃত্যু হইল এবং সেই সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ, দেওয়ান দুর্লভরামকে "রাজা" উপাধি দিয়া উড়িষ্যার সুবাদার করিলেন। তাঁহার সুবেদারীর অত্যল্প কাল পরেই মরাঠা-সৈন্য সহসা নাগপুর হইতে ঝড়ের ন্যায় আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। রাজা দুর্লভরাম এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনি মারাঠাদিগের নিকট পরাস্ত ও বন্দী হইয়া নাগপুরে নীত হইলেন। মারাঠারা জানকীরামের পুত্রকে পাইয়াও, কেন যে ভাস্কর পণ্ডিতের অন্যায় বধের প্রতিশোধ লন নাই, তাহা ঠিক বলা যায় না, সম্ভবতঃ দুর্দ্দম অর্থলোভই ইহার হেতু।

দুর্লভরামের সাহসও অতি দুর্লভ ছিল; যমালয়ের মত মারাঠা কারাগারেও তাঁহার সাহস অথবা উৎসাহের অভাব ছিল না; মুসলমান নবাব দরবারের সৌখীন সভ্যতায়ও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। একদা নিশীথ সময়ে উচ্চ মধুর স্বরে তিনি গান গাহিতেছিলেন; কারাগারের অধ্যক্ষ-সর্দ্দারের সহধর্ম্মিণীর কর্ণে এই গীতের স্বর অতিশয় মিষ্ট লাগায় তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন—"কারাগারে যে ব্যক্তির প্রাণে এত আনন্দ, তাঁহাকে এরূপে বাঁধিয়া রাখায় ফল কি?" দুর্গাধিপতি স্ত্রীর এই বাক্যের সারবত্তা বুঝিয়া রাজা

দুর্লভ রামকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন এবং কৃতজ্ঞ বন্দীও সময়ে সময়ে সুমিষ্ট গান গাহিয়া দুর্গাধিপ এবং তাঁহার পত্নীর চিত্ত বিনোদন করিতে থাকেন।

দুর্লভরাম প্রকৃতই বাঙ্গলার নবাব দরবারের দুর্লভ রত্ন ছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী, দুর্লভরামকে চিরকালই মারাঠা কারাগারে ফেলিয়া রাখিতে পারিলেন না,—তিনি মারাঠা নেতার সহিত সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মারাঠারা বলিলেন যে, যদি নবাব নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং তিন সুবার চৌথ স্বরূপ উড়িষ্যার সমুদায় আয় চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দেন, তবেই তাঁহারা দুলভরামকে ছাড়িবেন। নবাব অগত্যা এই বিপুল ধনের বিনিময়ে রাজা দুর্লভ-রামকে ছাড়াইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার পূর্ব্বপদ খালসার দেওয়ানীর ( Comptroller General of Armies ) কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের জীবনবন্ধু মহারাজ জানকীরামের পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা দুর্লভরাম বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে সোম বংশ "বায়াত্তুরে" বলিয়া নিন্দিত হইলেও কমলার কৃপার বলে মহারাজ জানকীরাম "গোষ্ঠীপতি" হইয়াছিলেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ এরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল যে এ দেশে উহার স্মৃতি অদ্যাপিও লুপ্ত হয় নাই।

পিতার পরলোক গমনের পরেই দুর্লভরামের দুর্লভ প্রতিভা প্রকট হইয়া উঠিল। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ শেষ বয়সে প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সহকারী সুবেদারের পদে নিযুক্ত করিয়া দুর্লভরামের হস্তে সমুদায় রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতেই দুর্লভ-রাম মুর্শিদাবাদের রাজস্ব ও সমর বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করায় রাজ্যের ধনাগার এবং সৈন্য-সামন্ত সমুদায়ই তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়ে। অত্যল্প কাল পূর্ব্বে হায়দারাবাদের নিজাম রাজ্যে দেওয়ান ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কায়স্থ-প্রবর মহারাজ কিষণপ্রসাদ যেরূপ প্রভাবশালী ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বাঙ্গলার নবাব-দরবারে রাজা দুর্লভরামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তদ্রূপ অথবা ততোধিক ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলীবর্দ্দী খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন এ

সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার মসনদে প্রকৃত নবাব হইয়া বসিলেন। এইবার বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা, গগণ আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিল। আলীবর্দ্দী খাঁর বিশ্বস্ত এবং প্রবীন কর্ম্মচারীগণ ক্রমশঃ সম্ভ্রম হারাইতে লাগিলেন। সামান্য মোহরের মুন্সী (কায়স্থ) মোহনলালকে সিরাজদ্দৌলা "সাত হাজারী মনসবদারী" এবং "মহারাজ বাহাদুর" খেতাব দিয়া "দেওয়ান-ই-আলা-মেন্দার-উল্-মোহন" পদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের উপরে "মীর মদন" নামক এক ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করা হইল। সাত হাজারী মনসবদার রাজা দুর্লভরাম ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, নূতন নবাবের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন।

এই সময় আবার সিরাজের পিতৃব্য-পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকৎজঙ্গ, কতকগুলি লোকের পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে দিল্লীর দরবার হইতে বাঙ্গলার সুবেদারীর সনন্দ আনাইয়া আপনাকে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সভার মধ্যেই ধনকুবের ও মহসম্ভ্রান্ত জগৎ শেঠ মাহতাব চাঁদের গালে এক চড় মারিয়া নিজের অকর্ম্মণ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন। মীরজাফর ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লী হইতে সনন্দ না পাইলে, তিনি অথবা তাঁহার কোন সহকারী সেনানী অস্ত্রস্পর্শ করিবেন না। এইরূপে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা সকলকেই তাঁহার শত্রু করিলেন।

ইংরাজ বণিকদিগের সহিত সিরাজের বিবাদ ও সেই জন্য সিরাজের বিনাশের বিবরণ সকলেই জানেন, সুতরাং তাহা নূতন করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই নাটকের যবনিকার অন্তরালে রাজা দুর্লভরাম সূত্রধার রূপে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা দুর্লভ রামের অধীনে দশ হাজার সুশিক্ষিত সেনা ছিল; সেই দিন এই সৈন্যদলও মীরজাফরের সেনাদলের মত কেবলমাত্র দাড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে "রণ পয়োধির লহরী" গণিতেছিল। মহাবীর মীর মদন নিহত হইবার পরও, কায়স্থ বীর মহারাজ মোহনলাল যেরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ

করিতেছিলেন, তাহাতে অল্পকালের মধ্যেই ক্লাইবের মুষ্টিমেয় সেনা কোথায় উড়িয়া যাইত! কিন্তু বিধাতার বিধান কে অন্যথা করিতে পারে? বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা—মীরজাফর এবং রাজা দুর্লভরামের বুদ্ধিকে—তাঁহারই অভিপ্রেত পথে চালিত করিলেন। সিরাজ কেবল মীরজাফরের কথায় ভুলেন নাই, তিনি রাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া পরামর্শ চাহিলেন। রাজাও পরামর্শ দিলেন,—"যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আপনি রাজধানী চলিয়া যাউন",—সিরাজ তাহাই করিলেন। মোহনলাল প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না, যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন, আর পলাশীর আম্র কাননে সেই শুভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে, ভারতে ইংরেজের মহাসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার পূর্ব্বে, ৪ঠা জুন তারিখে, মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের সন্ধিপত্র পাকাপাকি ভাবে স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সময়ে মীরজাফর নবাব হইয়া ইংরেজদিগকে দুই কোটি বাইশ লক্ষ টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন এবং রাজা দুর্লভরামকে এই টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন দিবার কথা স্থির হইলে, তবে তিনি রাজকোষ হইতে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে রাজা দুর্লভরামের যে প্রতাপ ছিল, মীরজাফরের সময়ে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে তাহার ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে আর কেহই ছিলেন না, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নবকৃষ্ণ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ সেন প্রভৃতি মহাত্মারা রাজনীতিতে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য মাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি এরূপ ছিল যে, তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে বাঙ্গলার সুবেদারী ও দেওয়ানী দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও যে তিনি পারিতেন, তৎসম্বন্ধে ইংরেজ কোম্পানীর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা অধিকতর স্বার্থের প্রত্যাশায় মীর কাশিমকে নবাবী দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজা দুর্লভরাম ক্লাইবের বিশেষ বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। ক্লাইব

দিল্লীর দরবার হইতে দুর্লভরামকে "মহারাজ মহীন্দ্র" খেতাব আনিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্লাইবের চেষ্টায় তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই নবাব নজমদ্দৌলা ৫৩,৬৮,১৩১৲ সিক্কা টাকা বৃত্তি লইয়া কোম্পানীর কথামত—মহারাজ দুর্লভরাম, মহাম্মদ রেজা খাঁ এবং জগৎশেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছাড়িয়া দেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁর ৯, লক্ষ, মহারাজ দুর্লভরামের ২ লক্ষ ও জগৎশেঠ সেতাব রায়ের ১ লক্ষ বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ দুর্লভরাম মহা সম্মান সূচক নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু ঐ বৎসরেই তিনি পরলোক গমন করেন। মহারাজ মহীন্দ্র দুর্লভরামের সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ রহিয়াছে,—

"স্বর্গে ইন্দ্র, মর্ত্তে মহীন্দ্র।"

মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর, এই মহারাজ মহীন্দ্র দুর্লভরামের পুত্র। মহীন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর, গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ বাহাদুর মুর্শিদাবাদে গিয়া মহারাজ রাজবল্লভকে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিন সুবার সুবাদার-দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে সুবা বাঙ্গলা চারিটী জেলায় বিভক্ত হইলে, প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ইংরেজ কালেক্টার নিযুক্ত হইলেও মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে তথায় এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ— আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে সুবাদারের বকশী (Pay Master General of the Army) ও সিরাজদ্দৌলার সময়ে প্রধান রায় রায়াঁ (Financial Minister) এবং পরে খালসার দেওয়ান (Comptroller General of Army) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ জেলা জাইগীর দিয়াছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইবের অনুরোধ সূত্রে কলিকাতা নগরের (তখন সুতানুটী গ্রাম) বাগবাজারে বাস করিতেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাজবল্লভের দেহ ত্যাগ হয় এবং তৎপূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের মৃত্যু হয়। রাজা মুকুন্দবল্লভের রাণী জয়মণি, রাজা গোকুলবল্লভকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজ রাজবল্লভের কুড়ি লক্ষ টাকার অধিক আয়ের সম্পত্তি ছিল কিন্তু ক্রমশঃ ভাগ্যলক্ষ্মীর বিরাগ বশতঃ আজ সেই বংশের কে যে কোথায় কিরূপ দশায় আছেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির

করা দুরূহ ;—আর বাহির করিয়াও লাভ নাই। মহাসমৃদ্ধ সেই সোমবংশের স্মারকরূপে 'রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট' এবং 'রাজা রাজবল্লভ ঘাট' এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে,—পরে কি হইবে তাহা ভগবানই জানেন। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দ ব্যাপিয়া এই বংশের তিনজন ভাগ্যবান পুরুষ বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

---

# দূরের যাত্রা।

## (জসিম উদ্দিন, ফরিদপুর)।

আমায় কেউ ডেক না আজ—
যাত্রা আমার অনেক দূরে ;
সবুজে ক্ষেতের হল্‌দে হাওয়ায়
ঘুরেছি-গান গেঠেঁল সুরে।
যেথায় নাচে হাজার চখা
মাঠের বুকে বিলের ধারে,
সেথায় আমার মন ছুটেছে—
হারিয়ে দিতে আপনারে।
শীতের দিনের মিঠেল রোদে
চাষী ভাইয়ের লাঙ্গল কাঁধে,—
সেথায় আমি যাব যে ভাই
ছুটব মাঠে তাদের সাথে।
তার পরে সেই সন্ধ্যে বেলায়
উড়িয়ে মাঠে গোখুর ধূলি ;
রাখাল ভাইয়ের চৌদিক ঘিরে
ছুটবে গেহে বলদগুলি,—

পল্লী মায়ের আঁচল ছেয়ে,
আঁধার যবে আসবে ধেয়ে,
তখন আমার জীর্ণ বীণা,
আপন সুরে উঠবে গেয়ে।
তার পরেতে আসবে ধীরে
মরণ ল'য়ে দখিণ হাওয়া ;
মিলন হবে সবার সনে,—
জীবনটীকে হারিয়ে দেওয়া।

# তাম্বূলোপহার।

(কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর)।

( ১ )

বাক্যে আর কার্য্যে যা'র কিছু মিল নাই,
কহে এক, করে আর,—ভিন্ন ভাব পাই।
সে জনে প্রত্যয় করি' যেবা স্থির রয়,
পরিণামে তা'র ক্ষোভ হয় সুনিশ্চয়।

( ২ )

করা ভাল পর-হিত সকল প্রকারে,
এর চেয়ে কার্য্য নাহি,এ খলু সংসারে।
স্বার্থকে উপেক্ষা করি' কৈলে পরহিত,
চির শান্তি বাস করে হৃদয়ে নিশ্চিত।

( ৩ )

সুখার্থী যে জন সদা সংযত হইবে,
পরম সন্তোষ তাহে অন্তরে পাইবে।
এ সংসারে সন্তোষই সর্ব্ব সুখ মূল,
ধন রত্ন,—সন্তোষের নহে সমতুল।

( ৪ )

এক ক্ষেত্রে শালি শ্যামা হয় দুই ধান,
উভয়ের দল কাণ্ড একই সমান।
গাছে পত্রে কাণ্ডে ভেদ নাহি দেখা যায়,
ফলেতেই উহাদের পার্থক্য জানায়।

( ৫ )

উদ্যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হয় সুনিশ্চয়,
মাত্র বাসনায় নাহি হয় ফলোদয়।
মৃগেন্দ্র ঘুমেতে যবে থাকে নিমগন,
তার মুখে মৃগ কভু পশে না কখন।

( ৬ )

নাহিক চন্দন চুয়া কর্পূর সুসার,
কি দিয়া সাজিব পান দিতে উপহার ?
নহে মিঠা খিলি, নাহি 'তাম্বুলবিহার',
কিসে হবে রসনায় রসের সঞ্চার ?
ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত কভু নাহি হবে,
বালিকাললাটে চির নিন্দা লিপ্ত রবে।
'বিজয় দাদা'র আজ্ঞা ঠেলে সাধ্য কার ?
তাঁরই আদেশে দিনু "তাম্বুলোপহার।"*

---

* বৈশাখের পত্রিকায় লেখিকার "নূতন খাতার মিঠাই" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হয়। সহকারী সম্পাদক মহাশয় মিঠাই জলযোগ করিয়া তৎপরে "তাম্বুল" চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে এই কবিতাটী পাওয়া গিয়াছে।

# বিধি-লিপি।

( শ্রীমতী চারুশীলা দেবী )।

নগদ দশ হাজার টাকা এবং ভবিষ্যতে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার লোভ পরিত্যাগ করিয়া সদ্য এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীমান্ কিশোর যখন দরিদ্র বালিকা উমাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল, বলাবাহুল্য কিশোরের মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বালিকা উমার সেই সরলতা মণ্ডিত অনিন্দ্য মুখ-শ্রী এবং সলজ্জ সশঙ্কিত বিনয় নম্রভাব, কিছুতেই কিশোরের মাতার মন হরণ করিতে সমর্থ হইল না। চকচকে ঝনঝনে দশহাজার গোলাকার রজতখণ্ডের শোক যেন দশহাজার কাটার মতন খর খর করিয়া তাহার অন্তর মধ্যে অহরহ বিঁধিতে লাগিল। পুত্র কৃতবিদ্য এবং স্পষ্টভাষী, ঈষৎ কোপন স্বভাবও বটে। একবার সে কোন কারণে রাগিয়া উঠিলে সহজে তাহাকে শান্ত করা যায় না। সে নিজে যেটা ভাল বুঝে সেই টাই করিয়া বসে। তাই মাতা যখন জমীদার বীরেশ্বর ঘোষের একমাত্র সন্তান লাবণ্য-প্রভার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং ভবিষ্যতে বীরেশ্বর ঘোষের জমিদারীর মালীক হইবার প্রলোভন দেখাইলেন, তখন নিতান্ত এক গুঁয়ে বোকা ছেলে এত প্রলোভন সত্বেও মাতার এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিল না। কবে সে তাহার কোন সহপাঠী বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া বন্ধুর একটী অরক্ষণীয়া ভগ্নী দেখিয়া আসিয়াছিল এবং বন্ধুর পিতা নাকি অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু তখন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই নাকি কিশোর একেবারে গলিয়া গিয়াছিল। সে নাকি বন্ধুর নিকটে অমনি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিল যে এম এ পাশ করিতে পারিলেই সে উমাকে বিবাহ করিবে; অতএব এখন আর সে তাহার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিল না। মাতার সহস্র যুক্তি তর্ক ভাসিয়া গেল, কিশোরের একই কথা।—"এখন আমি তাদের কথা দিয়ে কথা ভাঙতে পারব না।"

তাহার পর নববসন্তের এক সুন্দর যামিনীতে শ্রীমান্ কিশোরচন্দ্র বিনা আড়ম্বরে দরিদ্র-দুহিতা উমাকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিল। মাতার হৃদয়ে

দারুণ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; তিনি সরলা পুত্র বধূকে মাতৃস্নেহে বুকে তুলিয়া লওয়া দূরে থাকুক, অশেষ প্রকারে নির্য্যাতনের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। কিশোর বিবাহান্তে নব পরিণীতা পত্নীকে মাতার নিকটে রাখিয়া নব উৎসাহে আইন অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল; আর মাতা তাঁহার মনের যত ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন—এই নিরীহ উমার উপর। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—এই হতভাগা মেয়েটার জন্যই তাহার প্রচুর অর্থ এবং ভবিষ্যতে জমিদারী লাভের ব্যাঘাত ঘটিল। এই মেয়েটাই যে তাহার পরম শত্রু, সে সম্বন্ধে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; এবং এই 'ধেড়ে' মেয়েটাকে দেখাইয়াই যে মেয়ের বাপ তাঁহার নির্বোধ পুত্রটীকে ঠকাইয়া বিবাহ দিয়াছে, এজন্য উমার পিতার উপরেও তাঁহার দারুণ আক্রোশ হইল। কি প্রকারে ইহার একটা উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবেন মনে মনে দিবারাত্রি তাহাই কল্পনা করিতে লাগিলেন। উমা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা এবং ধীরপ্রকৃতি, সে প্রাণপণে নীরবে সংসারের সমস্ত কাজগুলি করিত, সর্ব্বপ্রকারে শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইত—কিন্তু হায়! সে সমস্তই নিষ্ফল। সে যে দরিদ্রকন্যা, রিক্ত হস্তে পিতৃগৃহ হইতে আসিয়াছে, সে কি আর শাশুড়ীর আদরের পাত্রী হইতে পারে? তাহার পিতা যদি তাহাকে সোনায় পাতে মুড়িয়া টাকার বস্তা সমেত শ্বশুরগৃহে পাঠাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও বরং সে কোনও দিন হয়ত শাশুড়ীর প্রিয় পাত্রী হইতে পারিত। কিন্তু এ সংসারে দরিদ্রকে আদর করে কে?

কিশোর কলিকাতাতেই থাকে, কলেজ বন্ধ হইলে যখন সে বাড়ী আইসে তখন উমার বিষাদ ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া সে বড়ই ব্যথিত হয় কিন্তু উমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও এ বিষন্নতার কারণ কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রাণান্তেও উমা শাশুড়ীর নির্য্যাতনের কথা স্বামীর নিকটে প্রকাশ করিত না। সে জানিত, সে দরিদ্রের কন্যা, সুতরাং এ নির্য্যাতন তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। উমার মলিন মুখখানি চুম্বন করিয়া কিশোর কতবার বলিয়াছে "দেখ, মা যদি কিছু বলেন, তাতে তুমি দুঃখ কোর না।" উমা স্বামীর সেই মিষ্ট কথায় সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। কিশোর কলিকাতায় গেলে, আবার সে কবে ফিরিবে, কবে তাহাকে মধুমাখা স্বরে "উমা" বলিয়া ডাকিবে, আদর করিবে,

উমা সেই সুখের কল্পনা বুকে লইয়া দিন কাটাইত। স্বামীর সোহাগ, স্বামীর যত্ন স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কতই সুখের চিত্র আঁকিত। সে পুলকের স্রোতে শাশুড়ীর শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা কোথায় ভাসিয়া যাইত।

এমনি করিয়া সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে উমার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিন বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে অতিবাহিত হইল। উমা সেই যে বিবাহের পরদিন নববধূরূপে স্বামীগৃহে আসিয়াছিল, তার পরে উমার শাশুড়ী আর তাহাকে পিত্রালয়ে যাইতে দেন নাই। "গরীবের মেয়ের আবার বাপের বাড়ী যাবার রস কেন?"—বলিয়া তিনি উমার পিত্রালয় হইতে যখনই কেহ বধূকে লইতে আসিত, তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। এ দিকে কিশোরের ল পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এই পরীক্ষাই তাহার শেষ পরীক্ষা। পাঠের ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কায় সে বাড়ী আসা একেবারে বন্ধ করিল এবং প্রবল উৎসাহে পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল। উকিল হইয়া সে হাই কোর্টে প্র্যাকটিস্ করিবে, মাতাকে এবং উমাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিবে—ক্ষুদ্র পল্লী-বালিকা উমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, 'জুয়েলজিকেল গার্ডেন', 'মিউজিয়াম' প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইবে, তাহা দেখিয়া উমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিবে, কিশোরের উকিলের পোষাক দেখিয়া সে কত পরিহাস করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি কত সুখের কল্পনাতেই কিশোর বিভোর! সেই সমস্ত সুখের কল্পনায় তাহার মন 'এরোপ্লেন' হইতেও দ্রুতবেগে কল্পনারাজ্যে ছুটিয়া চলিত।

২

জীবনের সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর বৎসর সংসারের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যখন কাশীনাথ বাবু বিশ্রামলাভের আশায় ক্লান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া বধূ যোগমায়া প্রমাদ গণিল। কাশীনাথ বাবুর একমাত্র পুত্র অনিল কলিকাতা থাকিয়া ডাক্তারী পড়িত; পুত্রবধূটীকে লইয়া কাশীনাথ বাবু শান্ত পল্লীমাতার অঙ্কে তাঁহার দেশের বাড়ীতেই থাকিতেন। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে না আছে ডাক্তার-কবিরাজ, না আছে কাশীনাথ বাবুর অর্থবল; এবং পুত্র অনিল ভিন্ন এ জগতে তাঁহার আত্মীয়ও বড় কেহ ছিল না। তাঁহার

গৃহিণী বহুদিন পূর্ব্বেই স্বর্গগতা হইয়াছেন, তাই গৃহের কর্ত্রী এখন যোগমায়া বধূ যোগমায়াই এখন কাশীনাথ বাবুর মাতার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যোগমায়া যখন একাদশ বৎসরের বালিকাটী ছিল, তখন কাশীনাথ বাবু তাহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন; তাই সে কোন দিনই শ্বশুরের নিকটে লজ্জা করে নাই। সে পিতৃমাতৃহীনা বালিকা কাশীনাথ বাবুর নিকটে একাধারে পিতামাতার স্নেহ পাইয়া তাহার সমস্ত হৃদয়টুকু শ্বশুরের সেবাতেই উৎসর্গ করিয়া ফেলিল। পাছে শ্বশুরের কোনরূপ কষ্ট হয় কিংবা কোনরূপ অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত; কিন্তু কাল কাহারও বাধ্য নয়। যোগমায়ার সহস্র যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও কাশীনাথ বাবু পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। যোগমায়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রাণপণে শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হ'ন, তখন কাশীনাথ বাবু অনুযোগ করিয়া বলিতেন—"নিজে সময় মত খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ো মা! এমন ক'রে সব সময় আমায় নিয়ে ব্যস্ত থেকো না,—অত অনিয়ম করলে শেষে নিজেই যে অসুখে পড়বে মা!"

কাতরকণ্ঠে যোগমায়া বলিত—"আগে আপনি ভাল হউন বাবা, তারপরে সব হবে।"

কাশীনাথ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"আর কি চিরদিন তোর এ বুড়ো ছেলেকে ধরে রাখতে পারবি মা? জীবনের ছুটী যে ফুরিয়ে আসছে!"

কর্ম্মঠ, সুস্থ ও সবলকায় শ্বশুরকে এমন ভাবে শয্যাশায়ী হইতে দেখিয়া যোগমায়া বড়ই ভীতা হইল এবং কলিকাতায় অনিলকে সংবাদ দিল।

পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অনিল তাহার জনৈক সাহাধ্যায়ী বন্ধু সহ তাড়াতাড়ি বাটী আসিল এবং সহর হইতে সিবিল সার্জ্জনকে আনিয়া পিতাকে দেখাইল; পরে নিজেরাই তাঁহার শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কাশীনাথ বাবুর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার সাহেব আসিয়া শেষ জবাব দিয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়াছি কিন্তু গতিক ভাল বুঝছি না, আপনারা ইচ্ছা করেন ত অপর ডাক্তার এনে দেখাতে পারেন।"

অনিল বুঝিল—পিতার জীবন রক্ষার আর কোন আশা নাই। কলিকাতা হইতে চিকিৎসক আনাইয়া পিতার চিকিৎসা করাইবার অর্থও তাহার নাই! ডাক্তার সাহেবের কথা শুনিয়া অনিল অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল—"আপনি যদি রোগ আরাম করতে না পারেন তবে আর কে করবে? এ দেশে আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার আর কে আছে যে তাঁকে আনবার কথা বলছেন? দেখুন আপনি যদি কোন উপায়ে বাবাকে বাঁচাতে পারেন।"

কাশীনাথ বাবু বুঝিতে পারিলেন তাঁহার জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া আসিয়াছে,—তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। তিনি অনিলকে ডাকিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"অনিল বাবা! আমার জন্য বৃথা কেন এত অর্থ নষ্ট কচ্ছ? আমাকে এবার যেতেই হবে তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। চিরদিন কি কেউ সংসারে পড়ে থাকে? তবে একটা আক্ষেপ উমাকে আর বুঝি দেখতে পেলেম না। সেই যে বিয়ের পরেই সে চলে গেছে,—তারা আর তাকে পাঠালে না!"

অনিল কোনও উত্তর করিতে পারিল না তাহার চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। পিতার এ সাধ পূর্ণ করিবারও সে কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইল না। সে জানিত পূর্ব্বে বহু অনুনয় বিনয় সত্বেও উমার শাশুড়ী উমাকে পাঠান নাই, আর এখনই যে পাঠাইবেন, সে আশাও খুব কম। কিন্তু তাহার সাহাধ্যায়ী যুবক নির্ম্মল বলিল—"আমি গিয়ে উমাকে নিয়ে আসব।"

অনিল তাহাকে চুপি চুপি বলিল—"সে আশা বৃথা! উমার শাশুড়ী বড় সাধারণ লোক নয়।"

নির্ম্মল বলিল—"মানুষ কি এমন চামার হইতে পারে? অন্য সময়ে যা করেছে—করেছে কিন্তু এ সময়ে না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। তুমি কিশোরকে সমস্ত কথা খুলে একখানা চিঠি লেখ, আমি গিয়ে উমাকে নিয়ে আসি। জন্মের শোধ সে কি একবার তার বাপকে দেখবে না?

নির্ম্মল, অনিল ও কিশোর সকলেই বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। নির্ম্মল ও অনিলের বাড়ী পূর্ব্বে কতবার আসিয়াছে। সকলে তাহাকে আত্মীয়ের মতই ভাবিত। অনিল নির্ম্মলের অনুরোধে কিশোরকে

পিতার অবস্থার কথা জানাইয়া এবং এ সময় যে, সে পিতাকে ফেলিয়া কোথাও নড়িতে পারিতেছে না, সেই জন্যই উমাকে আনিতে নির্ম্মলকে পাঠাইতে হইতেছে; এই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিল, কিন্তু "বিধিলিপি" খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিশোর সম্প্রতি বাসা পরিবর্ত্তন করায় অনিলের এই পত্র কিশোরের হস্তগত হইল না। এদিকে নির্ম্মলও উমাকে আনিতে গেল। নির্ম্মল পূর্ব্বেও কিশোরের বাড়ীতে দুই একবার গিয়াছিল, সেখানেও সে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। সে কিশোরের মাতার নিকটে গিয়া কাশীনাথ বাবুর পীড়ার কথা এবং তাঁহার উমাকে দেখিবার শেষ ইচ্ছার বিষয় উল্লেখ করিল; অনিল পিতাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে পারে না ও তাই নির্ম্মলকেই উমাকে আনিবার জন্য যাইতে হইয়াছে—তাহাও সে বলিল। নির্ম্মলের কথায় কিশোরের মাতার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একেত উমার পিতার প্রতি তাঁহার চির বিদ্বেষ, তাহার উপর পরের ছেলে নির্ম্মল উমাকে লইতে আসিয়াছে,—আর যায় কোথা?—তিনি ভাবিলেন এ কেবল তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই করা হইয়াছে,—"নির্ম্মল কোথাকার কে, যে সে উমাকে নিতে আসে?"

অনিলের মিনতিপূর্ণ কথার উত্তরে তিনি একটু তীব্র স্বরেই বলিলেন "তা বাছা আমি কি করে উমাকে পাঠাব বল? কিশোর বাড়ীতে নেই, তার অমতে আমি বৌকে পাঠাতে পারি?"

নির্ম্মল বলিল—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিশোরকে আমি জানি। সে এমন হৃদয়হীন নয়। এ সময় নিয়ে গেলে সে কিছুই বলবে না।"

উমার শাশুড়ী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না বাপুঃ সে রাগী মানুষ, যার তার সঙ্গে বৌ পাঠালে, সে আমার রক্ষা রাখবে না।—

নির্ম্মল চমকিয়া উঠিল,—উমার শাশুড়ীর এই অভদ্র জনোচিত উত্তরে মনে মনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহারও জিদ হইল যেরূপে হউক সে উমাকে লইয়া যাইবেই। পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা শুনা পর্য্যন্ত উমা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তার ক্রন্দনে শাশুড়ীর কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল না। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"ওঃ বাপের তো রক্ষা

বড়, তাই রাস্তার লোককে ধরে নিতে পাঠিয়েছে! লজ্জা করে না? আমার ছেলে কি কেউ নয় যে তার বউকে যে কেউ নিতে আসবে, আর অমনি তার সঙ্গে আমি বউ পাঠাব! বাপই যেন মরতে বসছে, কিন্তু অমন জল্‌-জ্যান্ত ভাই রয়েছে, সেত আর মরেনি! নেবার যদি ইচ্ছে থাকত, তাহলে সেই ত আসতে পারত!" শাশুড়ীর কথা গুলির তীব্র কষাঘাতে আরও দ্বিগুণ বেগে উমা কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মল উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ দমন করিয়া শান্তভাবে বলিল "আমি নিতান্ত একটা রাস্তার লোক নই। কিশোর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—অনিলও আমার ভাই, —তাতেই আমি সাহস করে উমাকে নিতে এসেছি, নইলে আমি আসতে পারতেম না! আর আপনি কিশোরের মা, আপনি যে আমাকে একেবারে না চেনেন, তাও নয়, এর আগেও আমি আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি। আপনি কেবল রাগের বশেই আমাকে এমন অপমান কচ্ছেন, এটা আপনার কি উচিত। কিশোর যদি আজ বাড়ী থাকত, তা হলে কখনই সে উমাকে আমার সঙ্গে পাঠাতে আপত্তি করত না। উমার বাপ মৃত্যুশয্যায়, জন্মের শোধ একটীবার মেয়েটীকে দেখতে চাচ্ছেন। এ সময় তাঁর উপর মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব রাখবেন না, একবার উমাকে পাঠিয়ে দিন, তার পর আমরাই তাকে রেখে যাব।"

উমার শাশুড়ী কিন্তু নির্ম্মলের কথা কাণেই তুলিলেন না। এদিকে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কোচমান বাহির হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"বাবু আউর দের্ করনেছে, ট্রিন্ নেহি মিলেগা।"

উমা চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। কান্না ভিন্ন তাহার আর উপায় কি? কান্নাই যে বঙ্গনারীর সম্বল! পিতা মৃত্যুশয্যায়; আর সে জন্মের শোধ একটী বার সেই স্নেহময় পিতাকে দেখিতে পাইবে না; এর চেয়ে যন্ত্রণা আর তাহার কি হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

———

# সাধন চতুষ্টয়।

( শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ )

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি॥

বিবেকচূড়ামণিঃ। ১৮শ শ্লোক।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিষয়ে পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সাধন চতুষ্টয় সাধকের শরীরে থাকিলে, তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হয়, এবং ইহাদের অভাবে সিদ্ধিলাভেরও অভাব হইয়া থাকে।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥
শমাদিষট্ক সম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যেবং রূপোবিনিশ্চয়ঃ॥

বি, চূ। ১৯। ২০ শ্লোক।

এই চতুর্ব্বিধ সাধন, যাহা অন্যত্র সাধন চতুষ্টয় রূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার আদিতে নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার পরিগণনা হয়। অনন্তর ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগেচ্ছায় বিরক্তি ভাব কথিত হয়। পরে শমদমাদি ষট্ সংখ্যক সম্পত্তি কথিত হইয়া মুমুক্ষুত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্তই নিত্যানিত্য বস্তু বিচাররূপে উক্ত হইয়াছে।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকঃ। দ্বিতীয় সাধন—ইহামুত্রার্থ ফলভোগ বিরাগঃ। তৃতীয় সাধন—শমদমাদি ষট্ক সম্পত্তিঃ। চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্বমিতি।

## ১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের অর্থ এই যে,—ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ। অর্থাৎ—নিত্য এবং অনিত্য, এই উভয় পদার্থের বিচার। সেই

বিচার কিরূপ? একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা, মনোমধ্যে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করাকেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে। ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করার নামই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার রূপে উক্ত হইয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষু প্রকরণের একটী শ্লোক দেখুন।

"অবশ্যমিহহি বিচারকৃতে সকলদুঃখ পরিক্ষয়োভবতি।

অর্থাৎ—তত্ত্ব বিচার করিলে মনুষ্যদিগের অবশ্য সকল দুঃখের পরিক্ষয় হয়।

## ২। ইহা মুত্রার্থ ফলভোগ বিয়োগঃ।

ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগের অর্থ এই যে,—"ইহ স্বর্গ ভোগেষু ইচ্ছ স্নাহিত্যম্।" অর্থাৎ—ইহ জগতের বিষয় সুখেচ্ছা, এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখেচ্ছা, এই উভয় প্রকার সুখভোগেচ্ছা না থাকার নাম ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ।

দেহাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত-হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষ দৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ। ২২শ শ্লোক।

ইহার অর্থ এই যে,—ভোগ্যবস্তু স্বরূপ অনিত্য শরীর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সকল শরীরে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করিয়া, অর্থাৎ নশ্বরত্ব বোধ করিয়া, বিষয়জালে যে আন্তরিক বিরক্তি ভাব, তাহারই নাম বিরাগ।

## ৩। শমদমাদি ষট্ক সম্পত্তিঃ।

শম, দম প্রভৃতি ছয়টী সম্পত্তি। সেই ছয়টী সম্পত্তি কি কি? "শমদমোপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধানঞ্চেতি।" অর্থাৎ (১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) শ্রদ্ধা এবং (৬) সমাধান।

এই শমদমাদি কাহাকে বলে,—এক্ষণে শাস্ত্র হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই বলা হইতেছে।

## ১। শমঃ।

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।
বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলকে ॥

বিবেক চূড়ামণি। ২৩ শ্লোক

অর্থাৎ—আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতাবস্থার নাম শম। অর্থাৎ মনোনিগ্রহকে শম বলে। শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত পরমাত্ম বিষয়ক শ্রবন মনন ও নিধিধ্যাসন ভিন্ন সংস্কার সম্বন্ধীয় বিষয়বর্গ হইতে মনের যে সংযম এবং ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন তাহাকে শম কহে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলন—"শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ।"—আমাতে নিষ্ঠতা যে বুদ্ধি অর্থাৎ—ঈশ্বর নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শমঃ।

## ২। দমঃ।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্যস্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

বি, চূ। ২৩ শ্লোকঃ ২য় ও ২৪ শ্লোক ১ম পংক্তি।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বিষয় পদার্থ হইতে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব আধারে সংস্থাপন করার নাম দম। অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা ও স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংসার বিষয় হইতে, নিগ্রহ করাকে বা নিবৃত্তি করাকে দম কহে।

## ৩। উপরতিঃ।

বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা।

বি, চূ। ২৪ শ্লোক, ২য় চরণ।

বাহ্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনাবলম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে। বিহিতানাং

কর্ম্মণাং বিধিনাঃ ত্যাগ। অর্থাৎ বেদাদি বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের যথাবিধানে পরিত্যাগকেই উপরতি কহে। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্ত্তনং বোপরতি। অর্থাৎ সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য প্রবৃত্ত মনকে, সেই বিষয় হইতে, আকর্ষণ করিয়া, আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তন করাকে উপরতি কহে।

## ৪। তিতিক্ষা।

সহনং সর্ব্বদুঃখানাম প্রতীকার পূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥

বি, চূ। ২৫ শ্লোক।

চিন্তা বিলাপ রহিত হইয়া অপ্রতিকার পূর্ব্বক সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে।

"শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহনং দেহ বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্ত।" অর্থাৎ যাহাতে শরীর নাশ না হয় এরূপ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে। "নিগ্রহশক্তা বাপি পরাপরাধে সোঢ়ুত্বং বা তিতিক্ষা। অর্থাৎ—নিগ্রহ করণ সামর্থ্য সত্বেও অপরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা কহে।

## ৫। শ্রদ্ধা।

শাস্ত্রস্থ গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥

বি চূ। ২৬ শ্লোক।

শাস্ত্র এবং গুরুবাক্য সত্যবোধে যে অবধারণ, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে। শ্রদ্ধা দ্বারা পরম পদার্থ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়।

"গুরু বেদান্ত বাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ।" গুরু বাক্য ও বেদান্তবাক্য প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

## ৬। সমাধান।

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্॥

বি, চূ। ২৭ শ্লোক।

নির্ম্মল ব্রহ্মে সদাসর্ব্বদা বুদ্ধির যে সংস্থাপন, তাহার নাম সমাধান কিন্তু সর্ব্বদা চিত্তের যে চালনা, তাহা সমাধান নহে; অর্থাৎ ঈপ্সিত উপভোগে চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে সমাধান সিদ্ধি হয় না। 'চিত্তৈকাগ্রতা' ব্রহ্মেতে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। 'শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনোবাসনা-বশাদ্ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং।'—অর্থাৎ পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয়গত হয়, সেই সেই সময়ে পদার্থ ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে মনকে সন্নিবিষ্ট করার নাম সমাধান।

এইবার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সাধনটীর বিষয় বলা যাইতেছে।

## ৪। চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্বমিতি।

মুমুক্ষুত্বং অর্থাৎ—"মোক্ষেঽতি তীব্রেচ্ছাবত্বং।" ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত যে অতি তীব্র বাসনা তাহার নাম মুমুক্ষুতা।

## এতৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তিঃ।

ইহাকেই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি বলা যায়।

সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সাধন চতুষ্টয়ের ভিত্তিমূল বৈরাগ্য বা বিবেক জ্ঞান। নিত্যানিত্য বস্তু বিচার দ্বারা এই বিবেক জ্ঞান পরিপক হয়। কিরূপে সেই বিচার করিতে হয়, তাহার প্রণালী এই—

"কোঽহং কথমিদং জাতং কোবৈ কর্ত্তাঽস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥"

অপরাক্ষানুভূতি। ১২ শ্লোক।

আমি কে? এই জগৎ কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেই বা এই জগতের কর্ত্তা এবং ইহার উপাদানই বা কি, অর্থাৎ—কি বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ অনুসন্ধান করা। এইরূপ অনুসন্ধানই বিচার এবং এই বিচারই জ্ঞানের কারণ।

সাধন চতুষ্টয়নিষ্ঠ ব্যক্তিই এরূপ বিচার করিবার যোগ্য পাত্র; তদ্ভিন্ন অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল মৌখিক বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারে; কিন্তু বিচারের ফল ভোগ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিতে পারে না। শান্তি লাভ করিতে না পারিবার কারণ—অবিবেক; অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞান রহিত জন্য অপারক হয়। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে যে আর কোনও উপায় শান্তি লাভ হয় না, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত। বেদান্ত-দর্শনে যেরূপ বৈরাগ্যাবস্থা দেখাইবার নিমিত্ত সাধন চতুষ্টয়ের বর্ণনা দেখা যায়, সাংখ্য-দর্শনেও সেইরূপ ব্যবস্থা দেখাইবার জন্য ক্রিয়া-যোগত্রয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াযোগত্রয় কিরূপ ? পাতঞ্জল-দর্শনে দেখা যায়—

"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥"

পাতঞ্জল দর্শন। সাধন পাদ। ১৮ শ্লোক।

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বর প্রণিধান;—এই তিন প্রকার কার্য্যকে ক্রিয়াযোগ বলে।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম—তপস্যা। প্রণব (ওঁকার) প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম—স্বাধ্যায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম—ঈশ্বর প্রণিধান। এই সকল ক্রিয়া-যোগ উত্তম প্রকারে অভ্যস্ত হইলে পরিণামে যে ফলের উদয় হয়, আর সাধন চতুষ্টয় উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেও, সেই ফলের উদয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ এই উভয় প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন মধ্যে যেইটিতেই কৃতকার্য্য হইবে। সেইটী দ্বারাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইবে। সেই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক, যোগ আশ্রয় করিবে যথা—

"বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥"

মনু-সংহিতা। ৬ অঃ। ৩৩ শ্লোক।

অর্থাৎ,—পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ এইরূপে দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, চতুর্থ ভাগে বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক, ঈশ্বরে মনঃ সমাসীন করত পরিব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

ইতি সাধন চতুষ্টয়ঃ।

---

# অন্ন-সমস্যা।

( শ্রীরাধারমণ দাস, ফরিদপুর )।

বর্ত্তমান সময়ে দেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ নানা প্রকার সময়োপযোগী বিধি-ব্যবস্থাদ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধনায় সচেষ্ট হন, কিন্তু এই স্থবির সমাজে তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়,—যে সমস্যাগুলির সমাধান জন্য তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হন, সর্ব্ব সময়ই সেই গুলির সম্পূর্ণ এবং সার্ব্বজনীন মীমাংসায় তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন না। দেশের সহস্রমুখী অভাব অভিযোগের সমাধান কিম্বা মীমাংসার কথা, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু অন্ন-সমস্যা-রূপ যে কঠিন বিষয়টী আজ বিকট-ভ্রূভঙ্গে সকলের সম্মুখেই উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

আমি অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না,—আমাদের বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথাই আমার আলোচ্য বিষয়। খাদ্যাদি ক্রমাগত এরূপ দুর্ম্মূল্য হইতেছে যে মধ্যবিত্ত লোকদিগকে বহু সময় অভাবের সহিত প্রতি-যোগীতা করিয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে হয়। বঙ্গভূমি চিরকাল শস্য-শ্যামলা বলিয়া প্রসিদ্ধ;—ইহা কি সম্প্রতি এতই অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িয়াছে যে এইক্ষণ তদুৎপন্ন শস্যদ্বারা সমগ্র বঙ্গবাসীর আহারের সঙ্কুলন হয় না? তাহা সম্ভব না। গত কয়েক বৎসর হইতেই কি অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আধি-

দৈবিক প্রকোপের ফলে দেশে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না ?—এরূপও বোধ হইতেছে না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে, প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।—

সাধারণতঃ অর্থাগমের প্রধান চারিটী পন্থা আছে,—কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় এবং চাকুরী। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় উপরোক্ত প্রথম তিনটী পথ পরিত্যাগ করিয়া,—চাকুরী সম্বল, চাকুরীগতজীবন হইয়া উঠিয়াছেন; এই তিনটীর একটীতেও তাঁহাদের অধিকার নাই,—এমন কি এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের বড় একটা দেখা যায় না। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিই নিযুক্ত আছেন এবং যাঁহারা ইহাতে লিপ্ত আছেন,—তাঁহারাও উপযুক্ত সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাবে, প্রাণহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। আবার, কৃষি এবং শিল্পের প্রতি ইহাদের আদৌ অনুরাগ বা উৎসাহ পরিলক্ষিতই হয় না।—"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, তদৰ্দ্ধ কৃষিকর্ম্মণি"—এই অতি মূল্যবান মহাজন বাক্যটী অনেকের মুখেই আবৃত্তি হয় বটে,—কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অতি অল্প লোকই সচেষ্ট হন। ইহার প্রধান কারণ, আমার বিশ্বাস, কৃষি ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষিত জন সাধারণ 'কর্ত্তব্য' বলিয়া মনেই করেন না; তাই বহুকাল উমেদারী করিয়া সৌভাগ্য বশতঃ মাসিক ৩০৲ কি ৪০৲ টাকা বেতনের চাকুরী জুটিলেই, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইল মনে করেন। এরূপ ধারণার কারণও বিদ্যমান; উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক চাকুরী বিহীন হইয়া বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইলে শিক্ষিত সমাজে তাঁহার স্থান ও সম্মান যেন অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং কতকটা অভাবে ও কতকটা মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় চাকুরীই শিক্ষিত লোকের অবলম্বন হইয়া উঠে; শুধু চাকুরীতে আর কত লোক প্রতিপালিত হইবে? তাই আজ এই অর্থসঙ্কট ঘটিয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকুরী বা ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের জানা উচিত—তাঁহারা উৎপাদনের কেহ নহেন,—অধিকন্তু উৎসন্নতার সহায়। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু তাঁহাদের অভাব পরিপূরণের জন্য অর্থ

আইসে কোথা হইতে? উপেক্ষিত নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় ও অল্পসংখ্যক শিল্পজীবির শ্রমার্জ্জিত উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া আর কতকাল চলিবে?

ইহার উপর, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসায়ের লভ্যাংশ কোটী কোটী টাকা নিজ তহবিলে পূর্ণ করিতেছেন। বঙ্গমাতার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, ইহার অধিকাংশই ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি, মাড়োয়ারী, পার্শী, দিল্লীওয়ালা এবং অতি অল্প সংখ্যকই এতদ্দেশীয়। এই সকল বিদেশাগত ব্যবসায়ীর অতুল ধনৈশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বাঙ্গলায় আসিয়া কোটী কোটী টাকা সঞ্চয় করিতেছেন, আর আমরা বাঙ্গালী?— সারাজীবন পরিশ্রমার্জ্জিত অগাধ বিদ্যার চাপরাস কোমরে বাঁধিয়া কেহ চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতেছি; কেহ বা ভাগ্যগুণে চারিশত কি পাঁচশত টাকা বেতনের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পদে সমাসীন হইয়া আপনাকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু অনেক সময় সে আয়ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না; কারণ উচ্চ পদের সম্মান রক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যয় বাহন করিতেই হয়, নতুবা পদমর্য্যাদার লাঘব ঘটে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্বারা দেশের অন্যবিধ কল্যাণ সাধিত হয় না কিন্তু তাহা নহে, ইহারাই দেশের সৌভাগ্য ও সম্পদের আধার; ইহাদের দ্বারাই চিকাগো, নিউ-ইয়র্কের ন্যায় নগরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন হইতেছে। ইহাদিগকে বাদ দিলে দেশ—দরিদ্র, শক্তিহীন ও নগণ্য হইয়া পড়ে। এ যাবৎ যাহা আমরা করি নাই বা করিবার চেষ্টা করি নাই, অন্য জাতি তাহা অবলম্বন করিয়া সম্পদশালী হইলে, সে দোষ তাঁহাদের নহে,—দোষ সম্পূর্ণ আমাদের। পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীগণ না আসিলে, হয়ত দূর দূরান্তর হইতে অপর কোন জাতি আসিয়া এই সুবিধা ভোগ করিতেন। বর্ত্তমানে যে সকল ব্যবসায়ীগণ কার্য্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রতিযোগীতায় তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া সে স্থান অধিকার করা দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিলে একেবারে অসাধ্য নহে।

আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন হইতে বহির্গত হন এবং আপনাদিগকে জন-সাধারণ হইতে পৃথক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন, তাই সংসার ক্ষেত্রে গত্যন্তর না পাইয়া অন্ততঃ মান সম্মান বজায় রাখিবার জন্যও সামান্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় কোন ব্যবসায়ে রত হইয়া সফলতা লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত বর্ত্তমানের সম্পদশালী মাড়োয়ারীগণ বিকানীর বা জয়পুর হইতে মূলধন আনিয়া বাঙ্গলা প্রদেশে ঐশ্বর্য্যের বিস্তার করেন নাই; কঠোর পরিশ্রম ও অসামান্য সহিষ্ণুতা গুণে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেরূপ পরিশ্রমকে শিক্ষিত লোক লজ্জাকর মনে করেন। এই লজ্জা একরূপ স্বাভাবিকও বটে; কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এ দেশে যেমন জন সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, সম্ভবতঃ জগতের অন্যান্য সুসভ্যদেশে সেরূপ হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমান হয়, আমরা কর্ম্মকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া কর্ম্মের সুখময় ফলই অনায়াসে ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; কিন্তু জগতের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ফলভোগের বাসনা বা আগ্রহ থাকিলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে নতুবা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইবেই।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা, কর্ম্মোপযোগী হওয়া আবশ্যক। রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া শুধু বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না। যদি বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়া শুধু আফিসের কেরাণী হইতে হয়, তবে সে উচ্চ শিক্ষার প্রসার যতই সঙ্কুচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। উচ্চ শিক্ষা মানব সমাজের উন্নতি বিধায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বিদ্বান হইলেই জ্ঞানী বা কর্ম্মী হয় না; জ্ঞান ও কর্ম্ম, পদার্থ-বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। মানবের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিয়া যে বিদ্যা জীবন-সংগ্রামে সহায় হয়,—সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা—সেই বিদ্যাই

মানব জাতিকে শান্তি ও সুখ প্রদানে করিতে সমর্থ; কিন্তু আমাদের গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, অধুনা ইহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে; বিনয়, সৌজন্য, অমায়িকতার পরিবর্ত্তে বরং অভিমানই দৃষ্ট হইতেছে। এই অভিমান কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, জ্ঞান ও উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ, কারণ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত মনে করেন যে, তাঁহারা জগতের সকল বিষয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন, লোকের সাহচর্য্যে আর একটু পরিপক্ক হইলেই অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত হইবে। জন-সাধারণের জ্ঞান যে কোন কালে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, ইহা সম্ভবতঃ তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও প্রচুর দেখা যায়।

শিক্ষার শেষ নাই; তুচ্ছাদপি তুচ্ছেরও সমীপবর্ত্তী হইয়া বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী না হইয়া শুধু বচন বিন্যাস দ্বারা জ্ঞানী সাজিলে, দেশের ও সমাজের পক্ষে বড়ই অকল্যাণ হয়। বিদ্যার্থীগণ যতদিন বিদ্যালয়ে থাকেন, ততদিন শ্রেষ্ঠ-জনোচিত উচ্চ আসনের একাংশের অধিকারী হওয়ার কল্পনা কুহকে মুগ্ধ রহেন, কিন্তু একবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর, অধিকাংশ স্থলেই, নিত্য অভা-বের তাড়নায় তাড়িত হইয়া তাঁহারা কোথায় যে অন্তর্হিত হন, তাহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। একটী কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশের কর্ম্মক্ষেত্র যতদূর প্রসারিত, আমাদের সেরূপ নহে। ক্ষেত্র, সময় ও অর্থাভাবে—প্রতিভা আপনি নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য দেশহিতৈষীগণের প্রধান কর্ত্তব্য,—কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করা; তাহাতে সংসার ও সমাজ নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হইলে, তাহাও একান্ত কর্ত্তব্য। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

# হরীতকী।

## ( শ্রীজীবনবিহারী সিংহ )।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

উত্তর ভারতের কুমায়ুন হইতে বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত; আর—দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার ১০০০ ফিট্ হইতে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতে; ব্রহ্ম রাজ্যে, সিংহল দ্বীপে এবং মলয় প্রায়োপদ্বীপে হরিতকীর বৃক্ষ জন্মে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জঙ্গল মাত্রেই হরীতকী বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোয়েম্বাটোর জেলার গাছগুলি খুব বড় হয়। গঞ্জাম, গুম্‌সর ও গোদাবরী বিভাগে হরীতকীর কিছুমাত্রও অভাব নাই। বোম্বাই প্রসিডেন্সীর ঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর সন্নিকটে ও সানুদেশে এবং বেল্‌গাম্, কণাড়া ও সুন্দার নিকটবর্ত্তী ঘাট প্রদেশে হরীতকীর বহু বন্ ( জঙ্গল ) আছে।*

একদা পরম সুখে উপবিষ্ট দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবন্! কিরূপে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার জাতিভেদ কত প্রকার; হরীতকীর রস, উপরস, নাম, লক্ষণ, বর্ণ ও গুণের বিষয়ই বা কিরূপ এবং কোন্ জাতীয় হরীতকী কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োজিত হয় এবং কোন্ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে কোন্ কোন্ রোগ নষ্ট করে? আপনি এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় বলিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। অতএব, জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সকল বিষয় যথাযথ বর্ণন করুন।"

প্রত্যুত্তরে দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন যে,—একদা ইন্দ্র অমৃত পান করিতে ছিলেন; ঐ অমৃত হইতে একবিন্দু ভূমিতে নিপতিত হইলে, সেই অমৃত বিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকী সপ্ত প্রকার; যথা—(১) বিজয়া, (২) রোহিণী, (৩) পূতনা, (৪) অমৃতা, (৫) অভয়া, (৬) জীবন্তী এবং (৭) চেতকী।—এই সপ্ত প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু সদৃশ,—অর্থাৎ শিরাবিহীন এবং গোল। রোহিণী হরীতকী সম্পূর্ণ গোল। পূতনা সূক্ষ্ম, অথচ অপেক্ষাকৃত বৃহদ্বীজ এবং স্বল্প শাঁস বিশিষ্ট। অমৃতা স্থূলত্বচা,—অর্থাৎ ত্বক মোটা এবং

ক্ষুদ্র বীজ বিশিষ্ট ; ইহারও শাঁস অধিক। অভয়া পঞ্চ রেখাযুক্ত এবং অত্যন্ত স্থূল নহে। জীবন্তী সুবর্ণ সদৃশ পীতবর্ণ, দেখিতে সুন্দর। চেতকী তিনটী রেখাযুক্ত।

এই সকল হরীতকীর মধ্যে বিজয়া সকল রোগেই প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ বিনাশকারী। পূতনা প্রলেপে উপকারী। অমৃতা সংশোধনের পক্ষে পরম হিতকর। অভয়া চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী। জীবন্তী সকল প্রকার রোগাপহারক। চেতকী চূর্ণে প্রশস্ত।—এই সকল বিবেচনা করিয়া হরীতকী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চেতকী হরীতকী আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ হরীতকী আয়তনে ষড়ঙ্গুল এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আয়তনে এক অঙ্গুল মাত্র। এই সকল হরীতকীর মধ্যে কোন কোন হরীতকী ভক্ষণে, কোন কোন হরীতকীর আঘ্রাণে, কোন কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমনাগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভেদ হয়। এই চেতকী হরীতকী হাতে করিয়া রাখিলে, যতক্ষণ উহা হাতে থাকে, ততক্ষণ কেবলই ভেদ হইতে থাকে ; হাত হইতে উহা ফেলিয়া দিলে ভেদ বন্ধ হয়। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও যাহাদিগের ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাদিগের চেতকী সুখ-বিরেচনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। এই সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়াই প্রশস্ত, সুখসেব্য ও সুলভ। বিশেষতঃ রোগের পক্ষে বিজয়া বিশেষ হিতকর।

নিরুক্তিতে লিখিত আছে যে, হরের ভবনে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছিল, এই জন্য ইহা হরীতা এবং ইহা সকল রোগ হরণ করে বলিয়া ইহাকে হরীতকী কহে। যথা ;—

"হরস্য ভবনে জাতা হরীতা চ স্বভাবতঃ।
হরেৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥"

নিরুক্তি।

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে :—

"হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভূয়স্তরতি যদ্বপুঃ।
হরীতকী তু সা প্রোক্তা তরতি দীপ্তবাচিকা॥"

ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

ইহা সেবনে সহসা ব্যাধি সমূহ প্রশমিত এবং শরীর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত ইহার নাম হরীতকী হইয়াছে। আরও লিখিত আছে—

"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।"

অর্থাৎ—গর্ভধারিণী জননীও কখন কখন সন্তানের উপর কুপিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু উদরস্থিতা হরীতকী কখনই কুপিতা হন না।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সুপক্ক হরীতকী সেবন করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না; সে ব্যক্তি অমর হইয়া থাকে। হরীতকী বৃক্ষে প্রতি বৎসর একটী মাত্র হরীতকী পাকিয়া থাকে; দেবগণ সেই পাকা হরীতকীটী গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য নরলোকে কেহই ঐ পাকা হরীতকীটী প্রাপ্ত হন না। সৌভাগ্য বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি ঐ পাকা হরীতকী প্রাপ্ত হন এবং সেবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর জরামৃত্যুর ভয় থাকে না।

চরক সংহিতায় দেখা যায় যে, হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্ট, ইহাতে কেবল মাত্র লবণ রস নাই। বাকী কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর—এই পঞ্চ রস ইহাতে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কষায় রসই সর্ব্ব প্রধান, রসনেন্দ্রিয়ের অনুভব যোগ্য। রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর বিপাক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুস্কর, মাংসবর্দ্ধক, অনুলোমক; এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, কৃমি, বিস্বরতা, গ্রহণী রোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা—হরীতকীগত মধুর, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা (উক্ত রোগসমূহ) ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহার কটু, তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা কফ এবং অম্ল রসদ্বারা বায়ু নষ্ট হয়। কটুরস ও অম্লরস দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হয় না। তিক্ত ও কষায় রসদ্বারা

বায়ু বৃদ্ধি হয় না। হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্ল রস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটু রস এবং অস্থিতে কষায় রস অবস্থিত।

যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোল, ভারী এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত ফলদায়ক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্তরূপ নূতন এবং যাহা স্নিগ্ধাদি গুণ যুক্ত এবং যাহার পরিমাণ দুই কর্ষ, সেই হরীতকীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত এবং সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ, আর—ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া খাইলে ত্রিদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। আহারের সহিত হরীতকী সেবন করিলে বুদ্ধির বিলক্ষণ বিকাশ, বল বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হয় এবং মূত্র, পুরীষ ও শারীরিক ক্লেদ সমূহ অনায়াসে বিনির্গত হইয়া যায়। আহারান্তে হরীতকী ভক্ষণ করিলে অন্ন পান কৃত দোষ হেতু বাত, পিত্ত ও কফ জন্য পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। হরীতকী লবণের সহিত খাইলে কফ; চিনির সহিত খাইলে পিত্ত; ঘৃত সহ খাইলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবনে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ঋতু বিশেষে যথাবিধি অনুপানে হরীতকী সেবন করিলে, সকল ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া, রসায়ন হইয়া থাকে। অনুপান বিশেষে এই প্রকার হরীতকী সেবনকে ঋতু হরীতকী কহে। এই ঋতু হরীতকী যাবতীয় রসায়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ঋতু হরীতকী প্রাবৃটে সৈন্ধব লবণ সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শিশিরে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং নিদাঘে গুড়ের সহিত সেবনে অতীব শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক তোলা পরিমাণ হরীতকী চূর্ণ এবং এক তোলা পরিমাণ অনুপান দ্রব্য, একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয়। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

যাঁহারা "ভাব প্রকাশ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিদিত আছেন যে, পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত, বলহীন, রুক্ষ শরীর, কৃশ, উপবাসী বা পিত্ত-প্রবল ব্যক্তি অথবা যাহার রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহাদিগের হরীতকী ভক্ষণ নিষেধ। গর্ভবতী রমণী মাত্রেরই হরীতকী সেবন একান্ত নিষিদ্ধ।

হরীতকী খণ্ড সেবনে সকল প্রকার অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শ প্রভৃতি রোগ অচিরাৎ প্রশমিত হয়। অম্লশূলে ইহা বিশেষ উপকারী।

হরীতকী তৈল।—ইহার গুণ—শীতল, কষায়, মধুর, কটু, সকল ব্যাধি নাশক, পথ্য ও নানাবিধ ত্বগ্‌দোষ নাশক।

হরীতকী রসায়ন।—(চরকোক্ত রসায়ন ঔষধ বিশেষ) রোগীর বলাবল অনুসারে এই রসায়নের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। এই রসায়ন পরিপাক পাইলে, ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শালি অথবা যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া উষ্ণ জল পান করিতে হয়। এই রসায়ন সেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অবিচার ও ভয় অপগত হইয়া থাকে; শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বল অতুল হইয়া থাকে; কোন প্রকার চেষ্টাই বিফল হয় না এবং ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। (চরক)

হরীতক্যাদি কষায় (ক্বাথ)—এই ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অতিশয় দাহযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্য রত্নাবলী)

হরীতক্যাদি বর্ত্তি।—ইহা চক্ষুতে দিলে কণ্ডূ ও তিমির রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)

হরীতকী বীজ।—হরীতকীর অস্থি, হরীতকীর আঁটী। ইহার গুণ,—চক্ষুর হিতকর, লঘু, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন।

হরীতকীর মোরব্বা।—অতি উপাদেয় ও অত্যন্ত উপকারী।

হরীতকীর বৃক্ষ অতি বৃহৎ। শরৎকালে এবং শীত ঋতুতে ইহাদিগের পত্র ঝরিয়া যায়। নববসন্ত সমাগমে পুনর্ব্বার নব পল্লব নির্গত হইয়া থাকে। হরীতকীর বৃক্ষ হইতে যে রস বহির্গত হয়, তাহা ঔষধের জন্য আবশ্যক হয়। যাহারা গাত্রে রং ব্যবহার করে, তাহাদেরই হরীতকী বৃক্ষের প্রয়োজন। ইহার ফলের শাঁস চূর্ণ করিয়া, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ইহাতে যদি কোন বস্ত্র ডুবাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বস্ত্রের বর্ণ ধূসর হইবে। হরীতকী ফল চর্ম্মকারগণের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। ইহার ক্বাথে পশুচর্ম্ম শক্ত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে হরীতকী চূর্ণের আবশ্যক। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও কোমল হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে

ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সঙ্কোচক অম্লরস আছে এবং তদ্দ্বারা সহজেই চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, হরীতকী বিক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসরে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে হরীতকীর যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। হরীতকী অনেক সময় "প্রাণদা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। সাত প্রকার হরীতকীর বিষয় আমরা অবগত আছি; তাহাদের বিষয় পূর্ব্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে পক্ক হরীতকী এবং জাঙ্গী হরীতকী, এই দুই প্রকার হরীতকী কেবল ঔষধের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি গোলাকার, মসৃণ ও ভিতরে ফাঁপা নহে, সেই হরীতকী গুলিই ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সেই প্রকার হরীতকীই ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যাহার শাঁস অধিক, বীজ ক্ষুদ্র, ছাল পাতলা, সেই হরীতকীই উৎকৃষ্ট। হরীতকী,—জ্বর, কাসি, প্রস্রাব পীড়া, ক্রিমি, হাঁপানী, অর্শরোগ, আমাশয়, বমন, হিক্কা, হৃদ-রোগ, প্লীহা, যকৃৎ ও রক্তদূষণ—এই সমুদয় দুরূহ রোগের মহৌষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পীড়াতেই ইহা অন্যান্য ঔষধ সংযোগে রোগীকে সেবন করান হইয়া থাকে।

হরীতকী ফলের রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আরবদেশীয় চিকিৎসকগণও অবগত ছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রীক্ লেখক আকটুয়ারিয়্ জানিতে পারিয়াছিলেন। আরবগণ হরীতকীকে "ইহলিলাজ" বলিত। তাহাদের মত এই যে, গৃহে যেমন সুগৃহিণী, উদর মধ্যে হরীতকী সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)।

---

* এই সংখ্যায়ও এই প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতে অক্ষম হওয়ায়, আমরা প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা চাহিতেছি। সং

# বেলেঘাটায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

( শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক )।

বিগত ৫ই ও ৬ই আষাঢ় শনি ও রবিবারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশন, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে, কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলেঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার মহাশয়ের ভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের নানা জিলা হইতে প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; স্বেচ্ছাসেবকগণের চেষ্টায় কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই এবং আদর যত্নেরও ক্রটী হয় নাই। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য—মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা ( দিনাজপুর ), কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা এম এ প্রাজ্ঞ, রায় সাহেব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎকুমার মিত্র বি, এল, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ( টাকী ), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, বাসন্তীচরণ সিংহ এম, এ, বি, এল, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল, রায় বিনোদবিহারী বসু, নিবারণচন্দ্র দত্ত, বিপিনবিহারী ঘোষ ( অবসর প্রাপ্ত সবজজ ), কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্ত-চিন্তামণি, নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ, বি, এল, সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র (জমিদার হুগলি), মন্মথনাথ সরকার, আশুতোষ সরকার ( অবসরপ্রাপ্ত সবজজ ) রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব ( ইটালি ), পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক, রামকমল সিংহ, রঞ্জনবিলাস রায়-চৌধুরী, যোগেন্দ্রমোহন সিংহ, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শশাঙ্কশেখর সিংহ, অনারেবল রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ( শোভাবাজার রাজবাড়ী ), নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, রায় ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা প্রভৃতি।

প্রথম দিন বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় শঙ্খধ্বনি সহকারে সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে মঙ্গলাচরণ সঙ্গীতটী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার গান করিলে পর, পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ সংস্কৃত কবিতায় সভার উদ্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ সংক্ষেপে সমাগত সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুকে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। এই অভিভাষণে চারিশ্রেণী কায়স্থের মিলন না হইলে দেশের ও সমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, ইহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল। ইহার পর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় গণপতি বিদ্যার্ণবের রচিত অন্য একটী কবিতা আবৃত্তি করিলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহোদয় কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহোদয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটী সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু,—গৌরীপুরের মহারাজা প্রভৃতি যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন,—তাঁহাদের নাম পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের একটী সুললিত সঙ্গীতান্তে প্রথম দিনের সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিনের সভায় কায়স্থ জাতির কল্যাণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা-মূলক ২০টী প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। *

---

* আগামী সংখ্যায় এই প্রস্তাবগুলি আমরা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্পাদক।

# বিবিধ।

## ( সম্পাদক )।

### (ক) উপনয়ন :—

১। বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিক্রমপুর শেখরনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় দেববর্ম্মা রায় বাহাদুর মহাশয়ের কেন্দ্রে ২২ জন কায়স্থ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি আচার্য্যের ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

২। জিলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পিতাম্বর সেন দেববর্ম্মা মহাশয় গত ৪ঠা আষাঢ় রথযাত্রার দিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায়ের আচার্য্যত্বে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অত্র লোহারদাগা ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার; বয়স ৫৭। তিনি পরম বৈষ্ণব, তান্ত্রিক মতে নিত্য ৺ কালীমাতার পূজা করিয়া থাকেন।

### (খ) বিবাহ :—

১। গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ মালীগ্রাম ( ফরিদপুর ) নিবাসী মোক্তার স্বর্গীয় ৺শ্রীনাথ হোরবর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত হাতিয়াড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গুহবর্ম্মার শুভ পরিণয় ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেনা পাওনা সম্বন্ধে পাত্রীপক্ষ যাহা দিতে রাজি ছিলেন, পাত্রপক্ষ তাহাতেই সম্মত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। গত ২৯শে আষাঢ়, স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর দাশ গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ মনমোহন দাশ গুপ্ত বি, এর সহিত, ভাগার উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যানীয়া শ্রীমতী পারুলবালার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরপক্ষ বর-পণ বাবদ কোন দাবীই করেন নাই; এমন কি বরযাত্রীগণের পাথেয় এবং কুলীন বিদায় ইত্যাদি সমস্ত ব্যয়ই বরপক্ষ বহন করিয়াছেন।

### ( গ ) শ্রাদ্ধ :—

১। বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ বিক্রমপুর শেখরনগর নিবাসী রায় বাহাদুরের জ্ঞাতি স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র রায়বর্ম্মা ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন। ( মৃতকের বয়স ৯১ বৎসর ছিল )।

দৈবপ্রাপ্ত! উদাসীন সন্ন্যাসী প্রদত্ত দৈবপ্রাপ্ত!!!

# সৌভাগ্য-কবচ।

বার—সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই চারি বার। তিথি—ভদ্রা কিম্বা পূর্ণা তিথি।

নক্ষত্র—অশ্লেষা, আর্দ্রা, [illegible], অনুরাধা, পুষ্যা, হস্তা অশ্বিনী, মূলা।

এই সকল নক্ষত্র, তিথি, বার যে দিন একত্রে তিনটি মিলিত হইয়াছে, সেই দিন দিবা দশ দণ্ডের মধ্যে যাবতীয় [illegible] করিয়া শুদ্ধাচারী হইয়া (স্নান করিয়া আপন আপন ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া) স্বর্ণ, রৌপ্য, কিম্বা তাম মাদুলীতে কবচ পুরিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে অভিষেক করিয়া (যাঁহারা দীক্ষিত হন নাই তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা কিম্বা দীক্ষিত লোক দ্বারা অভিষেক করিবেন।) রেশমী সূতা অভাবে পৈতার সূতায় গাঁথিয়া পীড়ানুযায়ী নিম্নলিখিত স্থানে ধারণ করিতে হইবে। ১। মস্তকে ধারণে মাথাধরা, মাথাঘোরা, শিরঃশূল, শির বেদনা, মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) মস্তিষ্কের শূন্যতা, স্মরণশক্তির ন্যূনতা, মস্তিষ্কের যাবতীয় পীড়া ত্বরায় প্রশমিত হয়। ২। বক্ষে ধারণে অম্লপিত্ত, স্নায়ুশূল, গুল্মশূল হৃদরোগ, যক্ষ্মাকাশি, বেদনা আরোগ্য হয় ৩। কটিতে ধারণে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি, উদরাময়, আমাশয়, গ্রহণী, প্রমেহ, অর্শ মূত্র পীড়া, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, রজঃকষ্ট, মৃতবৎসা, বন্ধ্যাত্ব, প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। ৪। বাহুতে ধারণে সর্ব্ববিঘ্ন নষ্ট হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হয়।

নিষেধ:—উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, অশৌচ, স্পর্শ করিবেন না। পান করিয়া কবচ ধুইয়া জল খাইবে। কবচে রোগীর অচলা ভক্তি থাকা চাই। স্মরণ রাখিবে এই কবচ দক্ষিণা কালীমাতার। মূল্য পূজার [illegible] ১।০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীদীননাথ বসু, গ্রাম বেড়াদী, [illegible], ( ফরিদপুর )।

---

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ২৲ মাত্র; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু বৈশাখ সংখ্যা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন কারণে কাগজ না পান তাহা সময়ে না জানাইলে পরে মূল্য দিয়া কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

[illegible] পত্রের উত্তর জন্য রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাতে হয়। [illegible] লিখিবার সময় নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীবিজয়গোপাল মজুমদার বর্ম্মা।

---

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg No. C. 653

মাসিক পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ ] [ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৩৭ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

ফরিদপুর।

# সূচীপত্র।

( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী )

# আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। { শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

## নারী।

( শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা )

( ১ )

বিশ্ব বিজয় করিতেছে নারী হানিয়া অপাঙ্গে নয়ন-বাণ,
দেখিতে দেখিতে পড়িছে লুটায়ে চরণে তাহার সহস্র প্রাণ।
রূপের অনলে কত যে মানব পতঙ্গের দশা পেতেছে সদা,
সুরা মদিরায় প্রমত্ত হ'য়ে, কত যে জীবনে লাগিছে ধাঁধাঁ।
তবুও নারীরে দুর্ব্বলা বলিবে অবলা বলিয়ে ঘৃণিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়।

( ২ )

শাস্ত্রে রয়েছে নারীর শকতি জ্বলন্ত অক্ষরে কত যে লেখা,
ইতিহাস হ'তে এখনো মুছেনি তাদের মহান্ কীর্ত্তি-রেখা।
এখনো রয়েছে পদাঙ্ক চিহ্ন উপন্যাস আর কাব্য কাননে,
বিশ্ব ব্যাপী শক্তি তাদের, প্রত্যেক গৃহী সে কথা জানে।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে ঠেলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ জগৎ পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়।

( ৩ )

দুঃশাসন আর কীচক নিধন,—কীর্ত্তি গরিমা দ্রৌপদীর,
লক্ষ বুকের রক্ত-রাগে রঞ্জিত পদ পদ্মিনীর।
সীতার হরণে লঙ্কাধীপের রাজ্য ও বংশের হয়েছে শেষ,
ক্লাওপেট্রার রূপের অনলে ভস্ম হয়েছে মিশর দেশ।
তবুও তাদের দুর্ব্বলা বলিবে অবলা বলিয়ে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

( ৪ )

বারাঙ্গনা তরে কত যে মানব হয়েছে পতিত করিছে পাপ,
কত বিপত্নীক হারা'য়ে পত্নী সহিছে চিত্তে অশেষ তাপ।
মেনকা হরিল নীরব সেবায় ধ্যান নিরত ঋষির মন,
মোহিনীর রূপে মুগ্ধ সতত ত্রিদিব নিবাসী দেবতাগণ।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে দলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ পতিত-পাবন লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

( ৫ )

নূরজাহানের ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিতে পারিত এ দেশ মরু,
রিজিয়া ধরিয়া শাসন দণ্ড স্থাপিল ভারতে কীর্ত্তি গুরু।
ঝান্সির রাণী দেবে না ঝান্সি করিল ব্রীটনে যুদ্ধ দান,
ভিক্টোরিয়ার বিশাল রাজ্যে সূর্য্য হ'ল না অস্তমান।
তবুও নারীরে করিবে ঘৃণা অবলা বলিয়ে ঠেলিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়।

( ৬ )

মমতাজের একটী বাক্যে উঠিল মহাল কীর্ত্তিমান্,
হেলেনের রূপ অনল প্রদাহে ট্রয় ভস্মে মজ্জমান।

জন ডি আর্কের ছত্র ছায়ায় মিলিল অযুত বীরের প্রাণ,
লুণ্ঠিত পতাকা তুলিল গর্ব্বে, দলিত ফ্রান্স লভিল মান।
তবুও নারীরে অবলা বলিবে দুর্ব্বলা বলিয়ে ঘৃণিবে তায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ গোলক-পতি লুটায়ে পড়েছে রাধিকা পায়॥

( ৭ )

শক্তি,—সে যে গো বীরের সাধনা,—মুক্ত যাঁদের নির্ব্বাণ-দ্বার,
কবির সাধনা—বাণীর চরণ,—কল্প-কাননে বসতি যাঁর;
লক্ষ্মীর চরণে লুটা'য়ে শির অর্জ্জিছে মানব কতই মান,
নারী যে মোদের জননী ভগিনী,—সবার ঊর্দ্ধে নারীর স্থান॥
তবুও নারীরে দুর্ব্বলা বলিবে ঘৃণায় তাহারে দলিবে হায়,
মনে রেখো কৃষ্ণ জগৎ-পতি পড়েছে লুটায়ে রাধিকা পায়॥

---

# ভ্রান্তির শান্তি।

( শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাংখ্য-রত্ন )।

"তোমারে যে চাহে ওগো! তার কত শান্তি,
তোমারে ভুলিয়ে মোর দীর্ঘ পথ শ্রান্তি॥"

স্মৃতি যেখানে নীরব, চিত্ত যেখানে নিস্পন্দ, মন যেখানে জীবন সত্তায় সুপ্ত, কলল বুদ্‌বুদের তমোবহুল গুরু আবরণে যেখানে 'আমি' মাত্র বোধ প্রতিষ্ঠিত, মাতৃ-জরায়ু শয্যায় সেই অস্তি-নাস্তির অপ্রতীতি ক্ষেত্রে কে আমাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল? কোন্ অলক্ষ্য প্রেরণায় তখন জড় প্রাণ, রস রুধিরাদি পরিচালন পূর্ব্বক ভোগেন্দ্রিয়ের আধার গুলি রচনা করিল? কে নিঃসহায় ভ্রূণের চক্ষু যুগল ফুটাইল? সেই অন্ধকার গহ্বরে রূপাভিব্যক্তির কেন্দ্র হইতে রূপরশ্মি প্রদান করিয়া কে রূপ গ্রাহিকা দৃষ্টির প্রসাদন করিল? কোন করুণাময়ী [illegible]

মলয় স্পন্দনে ত্বগেন্দ্রিয়ে স্পর্শানুভূতি আনিয়া দিল? কাহার কৌশলে আমার দীর্ঘ সুপ্ত মনোভূমে চন্দ্রমসদ্যুতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিল?—আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম; সে জীবণাঙ্কুরেও কত দংশন জ্বালা! ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কাতর,—কত দৈহিক সন্তাপ, কিন্তু ভাষা অভাবে বুঝাইবার সাধ্য ছিল না। বাগ্‌-বাহিনী ধমনী তখনও অবরুদ্ধ, শব্দ-বাহিনী ধমনীতে ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি মাত্র উত্থিত। কে বলে,—স্মৃতি তখন বিস্মিতা? কে বলে,—কামনা তখন নিদ্রিতা?

আমাকে মাতৃবক্ষে নিদ্রিত পাইয়া স্মৃতি তখনও চিত্তপটে কামনার কত অতীত দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিত;—তাহা দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দে হাসিতাম, আবার নিমিষ মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইত,—আমি বিষণ্ণ বদনে কাঁদিতাম। আমাকে প্রভাত-মলয়-কম্পিত শিশির-মার্জ্জিত সুন্দর কুসুমটীর মত দেখিয়া রমণীর স্নেহাকুল ভুজ-যুগল সাদরে বুকে টানিয়া লইত, সারল্যের হাসিতে পুরুষ প্রাণে সুধাসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, প্রতি বিমল ঈক্ষণে স্বর্গীয় আলোক প্রস্ফুটিত হইত, প্রতি অঙ্গ স্পন্দনে অমর রাজ্যের পুলক বার্ত্তা ছুটিয়া আসিত, তখন আমি জানিতাম না যে আমার এ দেবোপম প্রভাত-অদৃষ্ট দুই দিন পরে বাসনা-তটিনীর ঝটিকা বিক্ষুব্ধ বক্ষ মধ্যে উত্তাল তরঙ্গবেগে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। স্ফটিক অদৃষ্ট-ভাণ্ডের তলদেশে যে অসংখ্য কামনার তীব্র দোষ বীজ লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত? তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, যে দিন প্রাণ সমাজে প্রেম নিবদ্ধ সূক্ষ্ম শিরাজাল প্রসারিত হইবে, সেই দিন এ হেম মায়ামৃগ [illegible] করিয়া বিদ্যা-বধূ হরণ করাইয়া লইবে,—স্বর্গীয় সারল্যে কালকূট কলসিত দেখিয়া সে দিন বিশ্ব নরনারী আর নিঃসঙ্কোচে এমন ভাবে আমার কাছে আসিতে পারিবে না।

শিশু আমি বালক-ভূমিতে দাঁড়াইলাম;—শব্দে শ্রবণ পুলকিত হইল, স্পর্শে ত্বক বিহ্বল হইল, চক্ষুতে রূপ দেখিয়া করতালি দিলাম। রসনা রসের সাগরে ডুবিয়া গেল, বসুধাঙ্গনে প্রাণ-পদের বিপুল পুলক নর্ত্তন আরম্ভ হইল। এ যেন সকলই আমার পূর্ব্ব স্বাদিত, সকলই পরিচিত, ইহাদের সম্বন্ধ যেন শিরায় শিরায় বিজড়িত ছিল। দীর্ঘ সুপ্তির পরে এ যেন

জাগরণ মাত্র।—এই ভাবে ইন্দ্রিয়-দ্বারে যখন আমি বর্ণ, গন্ধ, গীতি, রস, স্পর্শের আকর্ষণে নিত্য মুগ্ধ হইতেছিলাম, এমন সময় পার্থিব ধূলিকণা মধুময় করিয়া, বনস্পতিদিগকে মধুমান্ সাজাইয়া, আকাশে বাতাসে মধুর উৎস প্রবাহিত করিয়া, বিশ্বের নয়নে নয়নে মধুর রূপ ফুটাইয়া, বদনে বদনে অপাপ শ্রী জাগাইয়া, ধীরে ধীরে কৈশোর আসিয়া আমার সম্মুখে দাড়াইলেন।

জীবন-নাট্যে কৈশোরের অভিনয় আরম্ভ হইল।—দেখিলাম সকলই মনোরম, সকলই মধুর, হৃদয় আবিষ্ট হইল, কবিতার প্রকাশ হইল, ভারতীর বীণাধ্বনি মর্ম্মে আসিয়া শিরায় শিরায় সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিল, কল্পনা-নিকুঞ্জে অলি কুলের মোহন ঝঙ্কার, দয়া-দাক্ষিণ্যের পবিত্র উচ্ছ্বাস, বিশ্ব জনে আপন ভাবিবার একান্ত প্রয়াস, বিচার বিহীনা ভক্তির পদতলে লোটাইবার আয়াস,—কত বলিব?—সে যেন স্বর্গের মুক্ত দ্বার।

কে যেন আমার হাত ধরিয়া এই শান্তিময় রঙ্গ মঞ্চে বিচরণ করিতেছিল, তাহার স্পর্শে বড় শান্তি, বড় সুখ ছিল। জানি না, কোন্ সনির্ব্বন্ধ অদৃষ্ট-লগ্নে একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, এ শান্তির রাজ্যে আর একজন নবাগতের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে,—সম্মুখে কামনার হৈমাধারে ভোগের প্রোজ্জ্বলিত দীপালোকে উদ্ভাসিত রঙ্গালয়, তৃষ্ণার মোহন বাদ্য রোল, রাগের বিবিধ নর্ত্তন, বিবিধ বিচিত্র মূর্ত্ত সৌন্দর্য্যের বিলাস বিহ্বল প্রণয় ঈক্ষণ,—আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, কে যেন বলিল,—"এস এস, এ যৌবন-রঙ্গালয়ের বিবিধ মুক্তাখচিত বিচিত্র বৈদূর্য্যাসনে আসিয়া বস, সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন, রূপের মোহন ভবন দেখিতে দেখিতে তোমার নয়ন অবাক হইয়া যাইবে, নিত্য নবীনা কামনা শূন্য-চিত্তপটে মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিয়া দিবে।"

আমি আরও মুগ্ধ হইলাম। দৃশ্যপট আবার অন্তর্হিত হইলে, চাহিয়া দেখি,—জ্যোৎস্নাবসনা ধরণীর ফুল্লবক্ষে মিলন-আসর সজ্জিত, তথায় চেতনাময়ী কামনা আমার প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া,—তাহার স্পর্শে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিলাম, কৈশোরের পবিত্র কল্পনা-স্বর্গ ইন্দ্রজালবৎ নিমিষ মধ্যে বিচূর্ণ হইয়া গেল। জানি না, কি কৌশলে বিশ্ব সুখে আত্ম-সুখ আবার নূতন কল্পনা-স্বর্গ রচনা করিয়া লইল।

এখানে, রাগ-কুন্তলা কামনা-বসনা রমণীর কচিত বিশ্রুত মৃদুল কণ্ঠধ্বনি শুনিবার আশায় আমার শ্রবণ নিয়ত লোলুপ হইয়া রহিল, প্রজ্ঞা-চক্ষু আবরিত হইল,—আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। তার পর, দুগ্ধফেননিভ শয্যাতলে নিদ্রিত শিশুর প্রফুল্ল মুখ পানে চাহিয়া থাকা, সংসার নিকুঞ্জের নিয়ত ভ্রমর গুঞ্জন, ত্বকে উহাদের স্পর্শ সুখের প্রতীক্ষা, নয়নে উহাদের রূপতৃষ্ণা, হৃদয়ে উহাদের পরিতোষ কামনায় অসংখ্য কাম্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, নিশীথ শয্যায় উহাদের সহিত নিদ্রায় অলস ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়া, আবার প্রভাত মলয় স্পর্শে উহাদের সহিত জাগিয়া উঠা,—এই ভাবে আজ এক কোলাহলময় গভীর অরণ্যে উপনীত হইয়াছি। এ কামনারণ্যে জন্মজন্মার্জ্জিত হিংস্র সংস্কার রাশি ইতঃস্তত ধাবিত হইতেছে, হিংসার ভীষণ প্রতিহিংসা, বাসনা-দাবাগ্নির নিয়ত ঊর্দ্ধোজ্জ্বলন, পরশ্রীকাতরতার অবিরাম কুটিল দৃষ্টি, পরনিন্দা-পেচকের কলুষ কর্কশ রব, অভাবের নিষ্পেষণ, অভিমানের অর্থহীন উচ্চ গর্ব্ব,—ইহারাই এখানে সহচর হইয়া আমাকে কুটিল অদৃষ্ট পথে লইয়া যাইতেছে।

আবার অদূর অপরাহ্নে পলিত কেশে গলিত নয়নে মৃত্যুর দূত বার্দ্ধক্য আসিয়া উপনীত হইবে; চক্ষু জ্যোতিহীন, শ্রবণ বধির, চর্ম্ম লোলিত,—তবুও কম্পিত করে আশার মোহন ভাণ্ড লইয়া আমি সংসার পথে দাঁড়াইব; যৌবন-শ্রী বিলুপ্ত হইবে,—জীবন-সংগ্রামে ইন্দ্রিয় ক্ষীণ, ধমনী নিস্তেজ,—তবুও অন্তরে বাসনাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিবে; যত্ন নিবদ্ধ কুঞ্চিত কেশদাম, কুন্দ-নিন্দিত দন্তরাজি, দৈহিক বলের দাম্ভিকতা, নিত্য অভ্যস্ত বিষয় চাতুর্য্য,—কাহাকেও দেখিতে পাইব না, সকলই অদৃশ্য হইবে; রহিবে শুধু—তাহাদের পরিত্যক্ত জীর্ণ আসন। তার পর, পরপারে—মৃত্যুর কঠোর আহ্বান, জীবনের পারে—পুত্র-কন্যা পরিজনের মমতা, তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, সুরম্য আবাস, অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা,—সকলে মিলিয়া আমার শ্রান্ত হৃদয় মধ্যে প্রবল হাহাকার তুলিয়া দিবে। তার পরে, কাল-বসনা ঘোরা জীবন-সন্ধ্যা, কৃত কর্ম্মের ভবিষ্যৎ দণ্ডরূপা কত বিভীষিকাময়ী ছায়ামূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, ভয়ে মুখে কত বিকট ভঙ্গী প্রকাশিত হইবে, প্রাণ শিরায় শিরায় লুকাইতে চাহিবে, কিন্তু কাল-যবন-দূত সবলে তাহাকে ধরিয়া আনিবে।

এই ভাবে যন্ত্রণাময় জীবন-নাট্যের শেষ অভিনয়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট যন্ত্রণাময়ী অদৃষ্ট-সূচী দেখিতে দেখিতে, আমার সম্মুখে মৃত্যুর যবনিকা পড়িয়া যাইবে।

বার বার নাকি জীবনের অন্তে, মৃত্যুর যবনিকা তলে, আমি নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবার কত আকুল উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া, কত প্রিয় জন স্মৃতির উত্তপ্ত আবেগ বুকে লইয়া, অশরীরি আমি, বায়ুভূত নিরাশ্রয়ে কামনায় জ্বালাময়ী প্রেরণায় দিগ্ দিগন্ত ছুটিয়া গিয়াছি। ভোগ-লালসা-বিচলিত ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গের মত চিত্তভূমে কত দংশন করিয়াছে, সে আশীবিষে আমি জর্জ্জরিত হইয়া ভূতাকাশ বেদনাপ্লুত করিয়া তুলিয়াছি। তখন স্থূল শরীর ছিল না—সংকল্পাত্মক মন ছিল, সহস্র সম্ভোগ কামনা মনে কত বেদনাময় সৃষ্টি গড়িতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল,—তাহার সংখ্যা নাই। 'আমি' বোধ আছে, সংকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া তীব্রবেগে চলিতেছে, সুসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি বিদ্যমান,—অথচ স্থূল কার্য্যাত্মক ভোগায়তন অভাবে ভোগের পথ অবরুদ্ধ, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়,—সম্মুখে শীতল জল, পান করিবার উপায় নাই,—একি ভীষণ যন্ত্রণা!! বসুধা-বিলুণ্ঠিতা বিকীর্ণ-মূর্দ্ধজা প্রিয়তমার আকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া তীরবেগে ছুটিয়া গিয়াছি, কত ডাকিয়াছি,—"ওগো আমি আসিয়াছি",—কিন্তু সে আমার ভাষা শুনিতে পায় নাই, আমাকে দেখিতে পায় নাই!

বিলাসোপকরণ গৃহ শয্যা, পুত্র-কন্যার মলিন বদন, স্নেহময়ী মাতার জীবন-মৃত্যুর দীর্ণাবস্থা,—সকলই দেখিয়াছি কিন্তু ধরিতে আসিয়া আকুল বাহু বন্ধনে বুকে লইতে পারি নাই,—এই ত সেই জ্বালাময় নরক রাজ্য! এই ত সেই রৌরব কুণ্ড! এই ত ভোগের পরিণাম!! এ প্রবাহ চক্রে, আরও কত উত্থান, কত পতন, কত সুপ্তি, কত স্বপ্ন,—কে বলিতে পারে? ঐ উর্দ্ধে তমসাচ্ছন্ন ভীতির অনন্ত অদৃষ্ট রাজ্য, নিম্নে উন্মাদিনী মায়াম্বুধির অশ্রান্ত কল্লোল ধ্বনি, রাগ-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মোহ তরঙ্গের বেলা বিধ্বংসন, আবার ভীমকায় মকর-কেতনের শঙ্কাহীন বহ্বাস্ফালন,—দেখিতে দেখিতে নৈরাশ্যের হাহাকারে তৃষিত প্রাণ চমকিত হইতেছে।

তাই ভাবিতেছি, সংসার নন্দনের মধুময় কামনার সৌরভ—

শান্তি,—না—ভ্রান্তি! একি পরার্থ,—না—স্বার্থ! একি অসীম প্রেমের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি,—না—মায়ার লৌহময় শৃঙ্খল বন্ধন! একি তৃপ্তি,—না—অলীক স্বপ্ন! কে যেন অন্তঃস্থল হইতে বলিতেছে, "এ শান্তি নয়,—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি; এ পরার্থ নহে—বিপুল স্বার্থ, এ তৃপ্তি নহে,—স্বপ্ন মাত্র, এ যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, এখানেই ভোগ-বারির প্রথম উদ্ভব, এ ভোগ-বারিই আকাঙ্ক্ষার জননী, উহার প্রতি স্বচ্ছ বিন্দুতে তৃষ্ণার দুর্দ্দমনীয়া অতৃপ্তি; পথিক ভুলাইতে এ যে মায়া-মরুভূমি, এখানে পতিপ্রেম কামনা-সৃষ্ট, পত্নীপ্রেম বাসনার উদ্বোধন মাত্র, এ প্রেমে কর্ত্তব্য শিখায় না—ভুলায়; এ প্রেমে ত্যাগ নাই, শুধুই ভোগ, শুধু কামনার দান প্রতিদান, শুধু বাসনার বেদিকা পরে ছলনার ইন্দ্রজাল পাতা, আবার দুই দিন পরে তৃষ্ণার মদিরা পানে স্বার্থের ছুরিকাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা; প্রত্যক্ষ রাজ্যে এ দাম্পত্যের কাল্পনিক উচ্চপ্রাণতার দুই দিন কপট স্বরে আলাপনা, আবার একের দৃশ্য জগতের অন্তরালে তাহার আসনে, তাহার ভূষণে, তাহার বস্ত্রালঙ্কারের উপহারে, নবীনের পদতলে গড়াইয়া পড়া।"

হায় পুরাতন! হায় বিগত! পরলোকের ঊর্দ্ধ দেশে ধূমজ্যোতির স্পন্দনময় ছায়া পথে তুমি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল হৃদয়ে বসিয়া থাক! তোমার জন্য শুধু দুই দিনের হা হুতাশ—দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু অযত্নে গড়াইয়া পড়া—তার পর নবীনে ভুলাইতে পুরাতনের সেই পুরাতন প্রবঞ্চনা! হায় মানব-মকর! কামনার গভীর কাল জলে আর কয় দিন তোমার এ পুলক নর্ত্তন।

"ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থএব করোতি তাং।
পতিস্তাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন॥" (বেদান্তঃ)

পতির সুখের নিমিত্ত পত্নী পতি কামনা করে না,—পতিও পত্নীর সুখের নিমিত্ত পত্নী কামনা করে না,—এ চকোর মিথুন ভোগবারির বর্ষণ আশায়—কামনার মেঘ পানে তাকাইয়া থাকে মাত্র; এ কামনা বিস্মৃতি ডাকিয়া আনে,—নিরাশার মর্ম্ম বেদনায় হৃদয় ব্যথিত করে, অনিত্যে নিত্যাভিমান জাগাইয়া দেয়। কেন এমন হয়? জীবনের আদি, মধ্যে, অন্তে এ কি জ্বালাময়ী ভ্রান্তি? এ ভ্রান্তির অবসানে শান্তির প্রভাত আলোক কোথায় উদিত?

এ কি শুধুই কর্ম্মফল? সে ত অচেতন? তবে কাহার প্রেরণায় অচেতনের এ চেতনবৎ জনকত্ব?

এ কর্ম্মপটের প্রতি অঙ্গে ঐ না চেতনের ছায়া দেখা যায়, বিচিত্র জগতের অন্তস্তলে অনু পরমাণু বুকে চতুর-চিত্ত কে তুমি প্রতি মুহূর্ত্ত জাগরিত রহিয়াছ? তোমার নয়নে পলক নাই,—কর্ম্মে শ্রান্তি নাই,—কর্ম্মফলেও আসক্তি নাই,—তুমি পুরুষ কি নারী—বুঝিবার সাধ্য নাই, জীব কি অজীব জানিবার শক্তি নাই—তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য অথবা এ সকলের অতীত,—কে বলিতে পারে? ঐ ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত নীলিম আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহময় জ্যোতিষ্কমণ্ডল লইয়া, কি কৌশলে তোমারই শাসন পথে বিরাজিত? ক্লান্তিহীন—কোলাহলহীন অসংখ্য ভৃত্য, রাজ-রাজেশ্বর তুমি, মহামহিমান্বিত তুমি,—তোমারই চরণতলে চির অবনত। আবার ঐ অগণিত গ্রহরাজির মধ্যদেশে সৃষ্টির অনন্ত রূপ পরমাণু আপন ময়ূখ মালায় সংযোজিত করিয়া রূপাভিব্যক্তির এক সুবিশাল রূপ-ঘন দীপ্তিমান্ কেন্দ্র তোমারই করুণায় অবস্থিত; নিম্নে কানন-কুন্তলা শস্য-শ্যামলা ধরণী, বিবিধ সৌন্দর্য্য সম্ভার বুকে লইয়া তোমারই সাধনায় চির নিমগ্না; বৈতালিক গীতে তোমারই করুণা কীর্ত্তিত, বালার্ক কিরণে তোমারই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ক্ষরিত, অনন্ত নীলাম্বুধির প্রশান্ত বক্ষে তোমারই বিশালতা বর্ণিত, অভ্রভেদী হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে তোমারই বিজয় ধ্বনি নিনাদিত, তোমার রচিত বিশ্বে তুমি অনু পরমানু দ্ব্যণুকমধ্যেও নিত্য প্রতিভাত, তুমি জীবে জীবে—বর্ণ, গন্ধ, গীতি, রস, স্পর্শে, 'ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমে মণিগণে সূত্র ইব।' তুমি হৃদয়ের দেবতা, নিভৃত হৃদয়ে তোমার আসন পাতা!—আমি মায়ায় মজিয়া তোমাকে ভুলিয়া আছি, তাই যুগ যুগ এ দীর্ঘ ভ্রান্তির পথে আমার গতায়তির মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম নাই।

"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং
স্ত্রিয়ান্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥"

এ মায়া কাহার ?

"চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥"

(বেদান্তঃ)

পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট সত্ব, রজঃ, তমো দ্রব্যের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি দ্বিধা,—মায়া ও অবিদ্যা।

"সত্বশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
মায়া বিম্বোবশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥"

(বেদান্তঃ)

প্রকাশ-ধর্ম্মী সত্ব দ্রব্যের বিশুদ্ধাংশকে "মায়া" এবং অপ্রকাশ বহুল মলিনাংশকে 'অবিদ্যা' বলে। আধারের স্বচ্ছ এবং নির্ম্মলতা গুণে বিশুদ্ধ সত্বাংশে প্রতিবিম্বিত তুমি, সপ্রকাশই রহিয়াছ,—উহার বশীভূত হও নাই,—উহাকে বশীভূত করিয়া, 'মায়ী' ঈশ্বর নামে পরিচিত হইয়াছ।

"অবিদ্যাবশগস্তন্য তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সাকারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥"

(বেদান্তঃ)

আবার তুমি,—
মলিন-সত্ব অপ্রকাশ-ধর্ম্মিনী অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রাজ্ঞঃ, প্রায়েন অজ্ঞঃ, প্রায়ই জান না, এরূপ জীব রূপে 'আমি' ভাবে, নিত্য সুখ দুঃখে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। এখানে অবিদ্যার মালিন্যে তোমার স্বরূপ আবরিত হইয়া গিয়াছে।—প্রভো! এই ত সেই—প্রবোধনে কারণ তরু।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" (উপনিষৎ)

যেখানে দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহারা উভয়ে উভয়ের সখা, উহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্যজন করে না—দেখে, একজন (জীব) ঈশ্বর ভাবের অভাবে নিমগ্ন হইয়া শোক করে,— যখন অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন শোকের অতীত হয়।—এই ত সেই সাগর-বক্ষ,যেখানে আমি-রূপ জলবিম্বের উদ্ভব ; এই ত সেই অনন্ত মিলনের শাশ্বত ক্ষেত্র, যেখানে আমি-রূপ জলবিম্বের অনন্ত বিলয়। এখানেই, ঊর্দ্ধে

অতি ঊর্দ্ধে মুক্তির মুরলী হাতে লইয়া শাশ্বত বেদিকা পরে আমার প্রতীক্ষায় স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রেমরূপ দেবতা তুমি দাঁড়াইয়া; আবার এখানেই নিম্নে অতি নিম্নে, কণ্টক-রচিতাসনে, বিষ মদিরা পানে প্রমত্ত, তোমাকে বিস্মৃত আমি বসিয়া। হে সুন্দর! তোমার এ প্রতীক্ষা অনন্ত! এ প্রতীক্ষায় সসীমের সীমায় অসীমের আসা যাওয়া,—জ্যোৎস্না-স্নাত যমুনা সৈকতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতির 'আয়—আয়' বলিয়া ডাকা,—বুঝি অনন্তের সে মিলন উচ্ছ্বাসে বিশ্বপ্রাণ পুলকে স্পন্দিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিত,—সম্মুখে রূপঘন প্রেমময় দেবতা মিলন আশায় দুই বাহু প্রসারিয়া বিরাজিত!

এ সম্বন্ধ কত সুন্দর! কত মধুর!—অনাদি যুগের কত দীর্ঘ প্রেম-মূর্চ্ছনায় এ সম্বন্ধ নিত্য ঝঙ্কৃত, নিত্য সুপ্ত, নিত্য জাগরিত; এ সম্বন্ধ সাগর-গামিনী তটিনীর মত জীব নিবহে তোমার চরণতলে মিশাইয়া দিতে নিত্য প্রবাহিত। এখানেই কৃতির প্রকাশ—অস্তিত্বই এ কৃতির উদ্ভব ক্ষেত্র। যত দিন কৃতি নিদ্রিতা ছিল, তত দিন তুমি "অবাঙ্ মনসাতীত"। কৃতির প্রজ্ঞায় আপন অস্তিত্ব বুঝাইতে দ্বৈত ভাবে এখানেই তোমার বিকাশ। সহস্র পাপে হৃদয় আজ ব্যথিত, মন কলুষিত, তবুও জাগরণের প্রতি স্বার্থান্বেষণে,—স্বপ্নের প্রতি অলীক কল্পনায়, নিত্য সুখের আশায়, নিত্য মিলনের আশায়, প্রাণ কেন উদ্‌ভ্রান্ত? এ বুঝি তোমারই করুণা! এ বুঝি আমার নিভৃত হৃদয়ে বসিয়া তোমার 'আয়-আয়' বলিয়া ডাকা!—আমি দীর্ঘ কুটিল পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি,—ওগো অসীম সম্রাট্! একবার দৃশ্য-কেন্দ্রে ধরা দাও! আমার প্রভাতি নৈবেদ্য ভ্রমে ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছে, মঙ্গল দীপ নিবিয়া গিয়াছে,—মঙ্গল আরতির আয়োজন করিতে পারি নাই,—তুমি আসিয়াছ, কিন্তু রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে তোমার পূজা হয় নাই।

এস শুভদ! এস প্রভু এস! এস দেব এস! তোমার রসাল নন্দের পূতঃ সুরভী স্পর্শে আজ আমাকে পবিত্রিত করিয়া মিলনের রাজ্যে লইয়া চল।

শান্তি ॥

# বিধিলিপি।

( শ্রীমতী চারুশীলা দেবী )

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এমন সময় পাশের বাড়ীর ছাদ হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহার বড়-যা কল্যাণী মৃদুস্বরে ডাকিল—"ছোট বউ, শোন।"

কল্যাণী কিশোরের জেঠাত ভাই বিনয়কুমারের স্ত্রী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বিনয়কে কিশোরের পিতামাতাই মানুষ করেন, তিনিও তাঁহাদের ঠিক আপনার পিতামাতার মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং কিশোরের মাতাকেই 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। কিশোরের পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়কুমারই কিশোরের সমস্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় কোর্টে ওকালতী করিতেন। বিনয় ও কিশোরকে দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহারা সহোদর ভাই নহেন। এমনি ভাবেই তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে ছিল কিন্তু কিশোরের বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সহসা একদিন লোকে দেখিল, বিনয়কুমার খুল্লতাত পত্নীর সহিত পৃথক হইয়াছেন,—শুধু পৃথক নহে, উভয় বাটীর মধ্যে একটী প্রাচীর তুলিয়া কিশোরদের সহিত সকল সম্বন্ধ যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। বিনয়ের এই ব্যবহারে লোকে তাহাকে শত ধিকার দিতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে কি হইল,— কেহই তাহা জানিল না। জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীগণ নানাভাবে তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। পৃথক হইবার কারণ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কোনই উত্তর দিতেন না। এইরূপে "নিমকহারাম"—"বেইমান"—বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রচার হইয়া পড়িল। পৃথক হইলেও কল্যাণী কিন্তু প্রাচীরের পাশে মুখ বাড়াইয়া অবসর ও সুযোগ মত গোপনে উমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং এই মিষ্টভাষী বড় যায়ের কথাগুলি উমার বড়ই ভাল লাগিত, তাই শাশুড়ীর অজ্ঞাতে সুবিধা পাইলে সেও কথা কহিতে ছাড়িত না।

কল্যাণীর ইঙ্গিতে উমা ধীরে ধীরে ছাদে গেল। উমার শাশুড়ী তখন তর্জ্জন গর্জ্জন কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া, ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে

গিয়াছিলেন।—উমা কল্যাণীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছ, দিদি?"

প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে উমার সেই অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ খানির দিকে চাহিয়া কল্যাণী বড়ই দুঃখিত হইল; বলিল—"নিতে এসেছেন—.ক তোমার উনি?"

উমা বলিল—"আমাদের আত্মীয় কেউ নয় বটে, কিন্তু উনি দাদার খুব বন্ধু। আমরা ওঁকে নির্ম্মল-দা' বলে ডাকি। কলিকাতায় বাড়ী, খুব বড় লোকের ছেলে উনি, বড়ই ভাল মানুষ। ওঁদের সাথেও এক সঙ্গে পড়েছেন।"

কল্যাণী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তোমার দাদা যখন নিতে পাঠিয়েছেন, তখন কি আর না জেনে শুনে পাঠিয়েছেন? তা তুমি এক কাজ কর,—উনি ত গাড়ী নিয়ে এসেছেন, তুমি চলে যাও এর সঙ্গে।"

উমা হতাশ ভাবে বলিল—"কেমন করে যাব দিদি?—মায়ের যে মত হচ্ছে না।"

কল্যাণী বলিল—"মায়ের মত কস্মিন্ কালেও পাবে বলে ত বোধ হয় না। আর তা বলে কি জন্মের শোধ বাপকে একবার দেখবে না? তোমার শাশুড়ীর কিন্তু এ সময় এ রকম করা ঠিক হচ্ছে না, বিপদের সময় অত দেখতে গেলে কি আর চলে?"

কাতর কণ্ঠে উমা বলিল—"তবে কি হবে দিদি! কার কথাই বা মা শুনবেন!"—উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

কল্যাণী চিন্তিত হইয়া বলিল—"দেখ, তুমি চলে যাও। ঠাকুরপো এলে, আমি তাকে ডেকে সব বল্‌ব এখন।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি শুনে রাগ করবেন না ত?"

কল্যাণী বলিল—"ইস্, রাগ! রাগ অমনি পড়ে রয়েছে আর কি? এই যে বে হয়েছে তিন বছর,—কই?—কোন দিনই ত বাপের কাছে যেতে চাস্‌নি! আজ বাপ মরতে বসেছে, তা জন্মের শোধ একবার দেখবি না? রাগ করে, না হয় করবে; কিন্তু বেশী দিন থাকিস নি; শিগগির চলে আছিস্।"

উমা বলিল—"হাঁ, নির্ম্মল-দা'ও ত বলেছেন,—রেখে যাবেন।"

কল্যাণী বলিল—"তাই, করিস; এখন চলে যা। এ দিকের সমস্ত ভার আমি নিলেম,—কিছু ভাবিস না।"

উমা যেন হাতে স্বর্গ পাইল; কিন্তু দুর্দ্দান্ত শাশুড়ীর কথা মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে সে আবার বলিল—"আর যদি মা তখন বাড়ী ঢুকতে না দেন?"

কল্যাণী বলিল—"হ্যাঁ, বাড়ী ঢুকতে দেবেন না! না,—আর কিছু!"

উমা তবুও বলিল—'তবে যাব দিদি? কোন দোষ হবে না ত?'

কল্যাণী বলিল—"এতে দোষ আবার কি? বাপের বাড়ী যাবে,—বাপের নিদেন কাল,—বাপকে দেখতে! এতে যে 'না' বলে,—সে পাষাণ!"

কল্যাণীর কথায় উমা যেন বুকে বল পাইল। স্নেহময় পিতার শান্ত মুখখানি মনে পড়িয়া, মুমূর্ষ পিতাকে জন্মশোধ একবার দেখিবার জন্য তাহার প্রাণটা নিতান্তই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল—"তবে যাই, দিদি! তুমি দেখ তা হলে।'

কল্যাণীও সাহস দিয়া বলিল—"দেখ্‌ব, দেখ্‌ব,—তুমি বাপকে দেখে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এস বোন্!"

'তবে এই খান থেকে প্রণাম করি দিদি'—বলিয়া উমা উন্মাদিনীর মত নীচে আসিয়া নির্ম্মলকে বলিল—'চল নির্ম্মল-দা, জন্মের শোধ একবার বাবাকে দেখে আসি,—চল।'

নির্ম্মলও তাহাই চাইতেছিল, মুমূর্ষ বৃদ্ধের শেষ বাসনাটী পূর্ণ করিবার জন্য তাহার মনও যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল: তাই অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া, উমার শাশুড়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—'আমি উমাকে নিয়ে চল্লেম; উমার বাপের প্রাণটা বেরিয়ে গেলেই আবার রেখে যাব। ইতিমধ্যে যদি কিশোর আসে, তাকে বলবেন,—নির্ম্মল এসে জোর করে উমাকে নিয়ে গেছে। সে কি করে,—এর পরে দেখা যাবে।'—বলিয়াই নির্ম্মল আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। হঠাৎ উমার এতদূর সাহস হইতে দেখিয়া উমার শাশুড়ী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তার পর, নির্ম্মল ও উমার উদ্দেশ্যে নানা ছন্দে ও ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিলেন, কিন্তু

ইহাতেও তাহার মনের আক্রোশ গেল না,—এত বড় অপমানটার কেমন করিয়া খুব একটা বড় রকম প্রতিশোধ লইবেন, সেই চিন্তায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল।

*   *   *   *

সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া, চিরপ্রফুল্ল সদা হাস্যময়, কর্মঠ পিতাকে শীর্ণকায় ও শয্যাশায়ী দেখিয়া উমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে উন্মাদিনীর ন্যায় 'বাবা-বাবা' বলিতে বলিতে পিতার শয্যায় বসিয়া পড়িল ও অজস্র অশ্রুজলে পিতার পদতল সিক্তিত করিতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যুকালে, আদরিণী তনয়ার ম্লান ও অশ্রুসিক্ত মুখখানি দেখিয়া কাশীনাথ বাবু—"এসেছিস মা?"—বলিয়াই উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া উমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন; আর কোনও কথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, আজ উমাকে দেখিয়া তাঁহার বহু দিনের রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল।

## ৩

কাশীনাথ বাবুর মৃত্যুর দুইচারি দিন পরে, অনিল ও নির্মল পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, উমাকে রাখিয়া আসাই যুক্তি সঙ্গত। কাশীনাথ বাবুর মৃত্যুর সংবাদ কিশোরীকে লেখা সত্ত্বেও সে পত্রের কোন উত্তরই আসিল না। যেরূপ ভাবে উমাকে আনা হইয়াছে এবং উমার শাশুড়ীর যে রূপ উগ্র প্রকৃতি, সেই সকল ভাবিয়া কাশীনাথ বাবুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পর্য্যন্তও উমাকে রাখিতে তাঁহারা সাহস করিলেন না। বাঙ্গালীর মেয়ে,বাঙ্গালীর বধূ—চির পরাধীনা, পরমুখাপেক্ষিণী, তাই উমাও আর থাকিতে সাহস করিল না। এবার অনিল স্বয়ংই তাহাকে লইয়া চলিলেন।—কিন্তু উমা যখন দাদার সঙ্গে তাহার শ্বশুর বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, তখন কুটবুদ্ধিপরায়ণা উমার শাশুড়ী যে চাল চালিলেন, তাহাতে উচ্চ শিক্ষিত অনিলকুমারও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।—উমার আগমন জানিতে পারিয়াই, তিনি বহির্দ্বার আবদ্ধ করিয়া দিলেন ও দাসীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—'বিন্দি, ওদের বলগে মা,—যে বউ রাতের বেলায় পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাড়ী থেকে আমায় অমতে চলে যায়, তেমন বউকে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিতে পারব না; যেখানে

খুসী সে চলে যাক্।—এতদিন কোথায় ছিলেন তার ঠিক নেই, এখন এলেন—ভাইকে সঙ্গে করে! বল্‌গে—এ বাড়ীতে তার আর জায়গা হবে না।'

শিহরিয়া উঠিয়া বিন্দি দাসী বলিল—'ছিঃ মা! অমন কথা মুখে এন না। তোমার ঘরের বউ,—এতে যে তোমারই নিন্দে হবে!'

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিনী বলিলেন—'তাতে তোর কি! তোর অত সাঁউখুড়ি করতে হবে না, তুই চাকরাণী,—চাকরাণীর মতন থাক্। তোকে যা বলতে বলে দিচ্ছি, তুই তাই বল্‌গে যা—নইলে ঝাঁটা মেরে দূর করে দেব।'

গৃহিনীর কথায় বিন্দিও অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। সে ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোক, কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার অভ্যাস তাহার নাই,—গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল—'ঢের জায়গায় কাজ করেছি বাপু, কিন্তু তোমার মতন এমন লোক কোথায়ও আমি দেখিনি।—আমাকে বিদেয় করে দেবে বলে কিসের ভয় দেখাচ্ছ! দাও না বিদেয় ক'রে? আমার এক দোর বন্ধ—হাজার দোর খোলা!—আমি ত আর তোমার ঘরের বউ নই, যে ভয় পাব!'

বিন্দির কথা শুনিয়া অনিলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া প্রাচীর ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আর উমা?—তাহার মনে হইতে লাগিল—বুঝি তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন সমস্ত আলোক নিবিয়া যাইতেছে!—সে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অনিল উমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখন উপায়?'

হতাশ স্বরে উমা বলিল—'উপায় আর কি দাদা। আমার শাশুড়ীর যে কথা,—সেই কাজ। অমন জেদী মেয়ে মানুষ আর দুটী নেই!'

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকিবার পর, উমা বলিল—'দেখ ত দাদা! ঐ পাশের বাড়ীটা,—আমার জাঠতুত ভাশুরের। আমার যা-কে একবার আমার কাছে ডেকে দাও,—দেখি তিনি কি বলেন।'

অনিল বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিয়া গেল,—কিন্তু বিপদ যখন আসে, তখন একাকী আসে না। উমার দুর্ভাগ্য—তাই ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার ভগ্না

বেবাহোপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়াছিল; বাড়ীতে কেবলমাত্র এক জন ভৃত্য বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল।—যে একটু ক্ষীণ আশা উমার অন্তরে এতক্ষণ জাগরিত হইতেছিল, আলেয়ার আলোকের ন্যায় তাহাও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।—নিরুপায় অনিল ফিরিয়া আসিয়া রুদ্ধদ্বারে বহুবার করাঘাত এবং চিৎকার করিয়াও কোন ফল পাইল না; উমার শাশুড়ী দ্বার মুক্ত করিলেন না। অধিকন্তু অনিলকে দু-চারিটী শক্ত কথাও শুনাইয়া দিলেন।

সহসা উমার সেই তরুণ হৃদয়ে যেন কোথা হইতে অপরিসীম একটা শক্তি জাগরিত হইয়া উঠিল; তাহার নারী মহিমায়, নারীর ধর্ম্মে, যেন বড়ই আঘাত লাগিল,—তাই দৃঢ়স্বরে বলিল—'আর নয় দাদা! আমার জন্য তোমার অপমানের একশেষ হ'ল। এখন ফিরে চল।'

অন্যমনস্কভাবে অনিল বলিল—'কোথায় যাব, উমা'?

উমা পূর্ব্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল—'কেন তোমার ঘরে? এক মুটো ভাত কি আমাকে দিতে পারবে না?—সেটা কি বড় বোঝা ঠেকবে তোমার?—বল!—এক মায়ের পেটে দুজনের ঠাঁই,—আর, এক ঘরে কি ভাই-বোনের ঠাঁই হবে না? আমাকে কি তোমার ঘরে একটু ঠাঁই দিতে পারবে না?'—বলিতে বলিতে উমার মুখখানা যেন কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

অনিলের মুখ দিয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাবে নির্গত হইল—"ভাত—"

বাধা দিয়া উমা বলিল—"হ্যাঁ দাদা, ভাত!—দিতে পারবে না কি এক মুটো? আমরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে,—অভাগিনী, চির পরাধীনা! এক মুটো ভাতের জন্যই যে আমাদের এত জ্বালা! আমাদের হাত পা থাকতে আমরা খোঁড়া, চোখ থাকতে কাণা।—আমরা নিজের ক্ষুধা নিবারণের উপায় যে নিজে করে নেব, সে উপায় তো আমাদের নেই! পেটের জ্বালায় পরের মুখ চেয়ে আমাদের সকলের শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাথি ঝাটা সইতে হবে! আমরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে,—বহু জন্ম তপস্যার ফলে বাঙ্গলা দেশে নারী জন্ম পেয়েছি! তোমার ঘরে দাসী হয়ে থাক্‌ব, এক মুটো ভাত আমাকে দিতে পারবে না?"—মনের আবেগে এক নিশ্বাসে উমা এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল।

অনিল ব্যথিত হইল,—ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলিল—"এমন কথা কেন বলছিস্, উমা! আমার যদি এক মুঠো জোটে, তবে তোরও জুটবে। আমি যদি মাথা গুঁজে থাকতে পাই; তুইও পাবি,—কিন্তু—"

বাধা দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া, উমা বলিল—"আবার কিন্তু কি?"

অনিল বলিল—"শুধু এক মুঠো ভাত পেলেই কি তোর সব হবে?—আমি কলিকাতায় শেখরের কাছে না হয় তোকে রেখে আসব।"

দৃঢ় স্বরে উমা বলিল—'না, আর কারও খোসামোদ করতে হবে না! বাবার অসুখের কথা লিখ্‌লে, বাবার মৃত্যু সংবাদ দিলে,—চিঠির উত্তর পেয়েছিলে কি? তবে আর কেন দাদা? ওঁরা মায়ে-পোয়ে সুখে থাকুন, সুখে ঘর সংসার করুন; আমাকে যখন ওঁরা চান না, তখন আমিও কা'কে চাইব না। চল, ফিরে চল।'

গাড়ী তখন পর্য্যন্তও দাঁড়াইয়াছিল; উমা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। তখন অগত্যা অনিলও চিন্তিত মনে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী আবার ষ্টেসনাভিমুখে চলিল।

যে দিন উমা ফিরিয়া গেল, ঠিক তাহার পর দিনই কিশোর বাড়ী আসিল। সে পাশ হইয়াছে—এইবার মাতা ও পত্নীকে নিকটে রাখিব; তাহার মনে কত আশা। বাসা পরিবর্ত্তন হেতু; কোন পত্রই তাহার হস্তগত হয় নাই, তাই কাশীনাথ বাবুর মৃত্যু সংবাদ সে জানিতে পারে নাই।

কিশোরকে দেখিয়াই কিশোরের মাতা ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠেলেন। কিশোর একেবারে অবাক্! সে পাশের খবর লইয়া বাটী আসিল, কত সুখের কথা বলিবে, কত আনন্দ করিবে,—না—সহসা মাতার এই উচ্চ ক্রন্দনে,একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া ধীরে ধীরে মাটীতে বসিয়া পড়িল। মাতার উচ্চ ক্রন্দন রোল এবং উমাকে দেখিতে না পাইয়া,—সে উমার মৃত্যুই স্থির করিয়া লইল। অন্যান্য বারে সে বাটীতে আসিয়াই উমাকে দেখিতে পায়, উমা গৃহকার্য্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কই? এবার উমা ত নাই! সেই জন্যই বুঝি বাড়ীখানি আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাই, যেন কেমন হতশ্রী হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা! কবে মারা গেল?"

মা ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'কে রে?'

কিশোর কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।—উমা মরে নাই, তবে মাতার এ উচ্চ রোদনের কারণ কি? সে সন্দিগ্ধ চিত্তে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার বউ?"

মাতা হাতে মুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গিমায় আরম্ভ করিলেন—"মরেনি বাবা মরেনি.—ম'লে ত আপদ চুকে যেত! ইত্যাদি"

* * * * *

মাতার মুখে কিশোর যাহা শুনিল, তাহাতে সে মর্ম্ম বেদনায় দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল! সুযোগ বুঝিয়া মা বলিলেন—"সে যখন তোর দিকে চাইল না, তখন তুই বা কেন তার জন্য কাতর হবি? যেমন ছোট লোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলি, তেমনি উপযুক্ত সাজা দিয়া গেছে।—এখন একটা ভদ্র ঘরের মেয়ে নিয়ে এসে, ঘর সংসার কর।"

কিশোর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিল না, সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিল না, মাতার প্রস্তাবে তখনই সম্মত হইল। মা তখন বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন।

তাহার পর, এক দিন শুভলগ্নে, মাতৃভক্ত শ্রীমান্ কিশোরচন্দ্র এক বস্তা পুরা না হউক,—আধ বস্তা আন্দাজ টাকা এবং একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া নববধূ আনিয়া মাতার চরণে উপঢৌকন দিলেন।

(ক্রমশঃ)

# পরিণয়-গাথা। *

( শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত )।

মরমে লুকান কথা সরমে ফোটে না বাণী
নয়ন স্বপনে ঘেরা, ধীরে আসে নিশিথিনী ॥
নিবিড় তিমির তীরে উর্দ্ধে দেববালাগণ
শত স্নিগ্ধ আঁখি মেলি দেখিতেছে এ মিলন ॥
কেতকী কুসুম গন্ধে সুরভি মলয় বায়
দিগ্বধূ-গণ পাশে কি কথা কহিতে ধায়!
আজি এ বাঁশীর সুরে কি যেন পড়িছে মনে
কাঁপে স্মৃতি, ভাঙ্গে কূল,—উজান প্লাবন বানে।
কোথা "লক্ষ্মী"? জেগে থাক্, ঘুম যেন নাহি পায়,
আজিকার এ রজনী বিফলে যেন না যায়।
নীরবে ধরার বুকে বসন্ত মঞ্জরি উঠে,
গোপনে হৃদয়-কুঞ্জে প্রেমের প্রসূন ফোটে।

---

* বিগত ২৯শে আষাঢ় সম্পাদক মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী তরুবালার (লক্ষ্মীর) সহিত গুলপুর (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন রায়চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় উপলক্ষে,—অনুরুদ্ধ হইয়া লেখক এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।—আজকাল শ্রদ্ধাহীন যুবকগণ বিবাহ উপলক্ষে যে সকল উশৃঙ্খল ভাবের কবিতা লিখিতেছেন,—তাহা পড়িয়া অনেক সময় যুবকগণের অধোগতির কথা মনে হইলে বড়ই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।—আদর্শ রূপে এই কবিতাটী যুবকদের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করিতেছি। নারী—আমাদের জননী, নারী—আমাদের ভগিনী, নারী—আমাদের দুহিতা, নারী—আমাদের সহধর্ম্মিণী,—এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া কোন দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না।

সম্পাদক

পলকের স্পর্শ মাঝে অনন্ত জীবন আনা,
একটী চাহনি মাঝে জনম জনম জানা ;
এই ত রে শুভদৃষ্টি,—এই ইষ্ট-পরিচয়,
সারাটী জীবন পরে ইহারই সাধনাময়।

কোথায় "রবীন্দ্রনাথ"! দাঁড়াও দু'জনে আজ,
চেলাঞ্চলে হ'ক লগ্ন বরের মোহন সাজ।

দাঁড়াও সম্মুখে দোহে পুরুষ-প্রকৃতি ছবি,
সরসীর শ্যাম নীরে হাস্থক তরুণ রবি।

এই যে বেপথুমতী অবনতা তনুলতা,
চরণে ললিত গতি বুকভরা ব্যাকুলতা।
এ নহে শিশির কণা—চরণে দলিয়া যাবে,
এ নহে খেলার ফুল—ধুলায় পড়িয়ে রবে।

অন্তরে রয়েছে দীপ্তি আঁখি জলে পড়ে ঢাকা,
ভুবন পালিনী শক্তি করুণায় ঢ্রব রাখা।

অনলের স্বাহা এ যে অনিলের গতি,
জলদে বিদ্যুৎ জ্বালা ব্যোমে সরস্বতী,
ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা অই ক্ষুদ্র বুকে,
ক্ষমা তাই হাসি হয়ে ভাসে চোখে মুখে॥

এই রবি করে
বিধাতার বরে
এ মুখ
উজ্জল রবে,

সিঁথীর সিন্দুর
মিলন মধুর
চির দিন
স্থির রবে।

এ কামনা ক'রে,
রাজা রাখি-ডোরে
দিনু দুটী
হাত বাঁধি,
সকল সময়
মনে যেন রয়
"ভলি দিদি"
"মিনি দিদি"।

---

## প্রতিবাদ।

### মহানাম সম্প্রদায়ের প্রভু জগদ্বন্ধু-প্রচার।

( শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, আগ্রা )।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ই বৈশাখ তারিখের "সঞ্জয়" পত্রিকাতে বরিশালের শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের এক বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপনীতে কবিরাজ মহাশয় একটু নির্দ্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জনৈক "মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র" নামে পরিচিত যুবকের স্বেচ্ছাচারিত্ব ও শ্রীজগবন্ধুর সুনির্ম্মল প্রেম-ধর্ম্ম,—একই রঙ্গে ফলাইতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, জগবন্ধুর নামটী তাঁহার বিজ্ঞাপনীতে টিটকারীর ভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয় ফরিদপুরের গোয়ালচামট গ্রামে উক্ত জগবন্ধুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহার ভাষার তীব্রতা থাকিত না। যাহা হউক, এ বিষয়ে প্রতিবাদের ঔচিত্যানুচিত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, প্রকৃত তথ্য প্রচারিত হউক, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

বিগত ২।৩ বৎসর হইল, মহেন্দ্র নামা জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল, কতকগুলি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবক ও শিশু শিষ্য মণ্ডলীদ্বারা একটী "মহানাম

সম্প্রদায়” সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে জগবন্ধু প্রচার করিবার জন্য অভিযান করিতেছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার,—“মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র” স্বয়ং ও কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার। “ব্রহ্মচর্য্য” প্রকাশক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত, গত ১৭ বৎসর কাল নীরব থাকিবার পূর্ব্বে, শ্রীজগবন্ধুর যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার কতক অংশ মুদ্রিত হওয়ার পর, ইহারা তাহা হইতে কিয়দংশ গ্রহণে এবং জগবন্ধুর সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস-ব্যঞ্জক কথাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ও মনোমত গড়িয়া, “বন্ধু-বাণী” ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত মহানাম সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, গ্রন্থকার, বক্তা, যাজানদার, কালোয়াত, নর্ত্তক ইত্যাদি কাহারও সহিত, মৌনাবস্থার পূর্ব্বে প্রভু জগবন্ধুর বাণীর আদান প্রদান লেখকের ও শ্রীজগবন্ধুর স্থিরমতি ভক্তগণের জ্ঞাতানুসারে কখনও হয় নাই। যাহারা সাধারণ দৃষ্টিতে অনন্য ভাক্ হইয়া জগবন্ধুর ভজনা করিতে ও করাইতে উৎসুক, তাঁহাদের এ অসত্যাচরণ সমাজে প্রচারিত হওয়াই মঙ্গল, সেই হিসাবে কবিরাজ মহাশয় আমার প্রীতিভাজন। উক্ত বন্ধু-বাণীতে মহানাম সম্প্রদায় যে সব কল্পিত সূত্র (missing link) যোজনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিকৃত মস্তিষ্কের, অবতার প্রতিপাদন-চ্ছলে অবতার প্রতিপাদিত হইবার ঔৎসুক্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

জগবন্ধুর স্বহস্ত লিখিত “হরি পুরুষ” অর্থ করিতে গিয়া কবিরাজ মহাশয় জগবন্ধুর প্রতি বিশেষ নির্দ্দয় হইয়াছেন। চারি হস্ত পুরুষ বলিতে তিনি বোধ হয় চতুর্ভুজ ধরিয়াছেন। ‘চতুর্হস্ত স্বহস্তেন শাক প্রাংশু’—ইত্যাদি কথা বোধ হয় কবিরাজ মহাশয় অবগত আছেন।

শ্রীজগবন্ধুর কর্ম্ম (১) (Ethical conduct), ধর্ম্ম (৩, ৪) (Religion), ও অবতার বাদ প্রণালী (২) তাঁহার বিগত ১৭ বৎসর মৌনী থাকিবার পূর্ব্বে লিখিত কয়েকটী সূত্র হইতে নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই সূত্রগুলিই জগবন্ধুর আজ পর্য্যন্ত শেষ লেখা।

(১) “কৃতি—অস্তিত্ব।”—The highest good is the conservation or totality of existence—both of the subjective and the objective world, both qualitative and quantitative —জগবন্ধুর ধর্ম্মপন্থা—শ্রেয় ও প্রেমের একত্রানুষ্ঠান—চিত্ত ও বিত্তের মৈত্রী পন্থা (Deification of existence by matter and mind).

( ২ ) "পঞ্চরহস্য—অবতার, সাধু, মহান্ত, চোর, পতিত।"

এ জগতে কেহ অবতার, কেহ সাধু, কেহ মঠধারী মহান্ত, কেহ চোর, কেহ পতিত কেন? এই বৈষম্য বৈচিত্র্যের, এই দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী কে? চৈতন্যময় জগৎ বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ—রূপভেদ ও গুণভেদের বিরাট ঐশ্বর্য্যধারা। এই ভেদেই কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি—দ্বন্দ্বেই মনোবৃত্তির উন্মেষ ও পুষ্টি এবং করণীয়ের নির্দ্দেশ। দ্বন্দ্ব, কর্ম্ম প্রেরণা ও বাছনীর প্রাণ। এই দ্বন্দ্বে সেই মহাগুণী, সেই বহুরূপী, স্বতঃ প্রস্ফুটিত। অবতার, সাধু, মহান্ত, চোর, পতিত,—মোটামুটী এই দ্বন্দ্ব, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার (heredity, environment, convention, opportunity etc) সৃষ্টি,—এই সৃষ্টির জন্ম কোষ্ঠী, বৈষম্য বৈচিত্রের তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত। ঐ বৈষম্য বৈচিত্রে, এই অসীম রূপ-বৈষম্য ও গুণ-বৈষম্যের অন্তরালে যে স্ফুট মাধুর্য্য বিরাজিত, সেই অমৃতাস্বাদ যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার কাছে অবতার-বাদ রহস্য মাত্র, সাধু-সংজ্ঞা রহস্য মাত্র, দেবসেবার জন্য মহান্তের আবির্ভাব এক অদ্ভুত রহস্য, চোর কথাটী রহস্য মাত্র, পতিত আখ্যাটীও রহস্য মাত্র। এই বৈষম্য-বৈচিত্রে, এই দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধারণে, সেই মহামণ্ডলীর, সেই মাধুর্য্যময়ের, স্বরূপ আস্বাদন। এই বৈষম্য বৈচিত্র, এই দ্বিধা হইতে, এই জগতের উদ্ধারণ-প্রচেষ্টায়, সেই মহামণ্ডলীর, সেই মাধুর্য্যময়ের, বিরাট আস্বাদন। তাই জগদ্বন্ধুর ( ৩ ) ধর্ম্মসূত্র—"ধর্ম্ম উদ্ধারণ," মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ।"—Religion is elimination of antagonism. World-religion is elimination of world-antagonism. The realisation of love unfolds the mystery, and the spectrum of antagonism loses itself in a convergent sea of unitarian light.

এই দ্বিধা অনন্ত নাম (Noumenon) ও রূপে (Phenomenon) প্রকটিত হইতেছে। অনন্ত নাম ও রূপের সত্য জ্ঞানে (true knowledge of noumenon and phenomenon) ঐ দ্বন্দ্বের অবসান, অভেদের স্থাপন—একত্বের মধুর স্ফূর্ত্তি,—প্রেমের মধুর উন্মাদনা—অনন্তরূপে অনন্ত বিগ্রহদর্শন,—অনন্তরূপে সলীল ভাগবৎ-স্ফূর্ত্তি,—রূপ সমষ্টিতে ভাগবৎ বিরাট দর্শন।

জগদ্বন্ধু তিনটি সূত্রে এই 'উদ্ধারণ' কথাটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(৪) 'নাম উদ্ধারণ।'—'উদ্ধারণ অনন্ত বিগ্রহ।'—'কোটি কোটিতে এক অনন্ত হয়।'—'শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চ দশাতে উদ্ধারণ পূর্ণ।'—'True knowledge of noumenon is salvation. Evolution of God-consciousness in the Infinite *Rupa* (*Phenomenon*) is salvation. Fructification of mind as indicated above* is perfectly attained by culture of the five-fold sentiments—শান্ত, বাৎসল্য etc. on *Rupa* in the Concrete and the Abstract.

প্রেম-কোরক প্রস্ফুটিত হইলে, চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে, চিত্ত স্বতঃই অনন্ত রূপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হয়। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চ দশাতে মন এই সম্বন্ধ পাতিয়া লয়। রূপ ও অরূপকে এই পঞ্চমুখী অনুরাগে আপন করিয়া লওয়া, আপনকে জগতে বিলাইয়া দেওয়াই 'উদ্ধারণ।'

রূপীর সহিত মানব মনের শান্তরস সম্বন্ধ, পশু সৃষ্টির বৈর-দ্বন্দ্বের উপরে মানব সৃষ্টির ও মানব মনের স্বার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে। সত্য জ্ঞান আবির্ভূত হইলে, শঙ্কর এক দিন গাহিয়াছিলেন—"অহঞ্চ সোহঞ্চ ত্বতঞ্চ কোহম্"—ইহাই শান্তভাব।

বাৎসল্য রাগে রূপের সেবা,—সমাজ-রূপের চিত্তের প্রসার সাধন (education), স্বাস্থ্য-রক্ষণ (sanitation and housing) এবং গৃহ, পরিধেয়, বস্ত্র ও খাদ্যের ব্যবস্থা।

দাস্য, রাগে রূপের সেবা,—সমাজ রূপের (state) আইন কানুনের অনুবর্ত্তন, উৎকর্ষ সাধন ও পুষ্টি, সমাজে ন্যায়ের (justice) আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

সখ্য রাগে রূপের সেবা,—সমগ্র রূপ সমপ্রাণ (Equal) ভাবিয়া,—চিত্ত, বিত্ত ও কর্ম্মের আদান প্রদান, লোভ ও দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা।

'From every one according to his capacity. To every one according to his needs.'

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"

—ঈশোপনিষৎ

মধুর বাগে রূপের সেবা,—অনন্তরূপে, মহাগুণীর অনন্তরূপ ও গুণ ধারার অমৃতাস্বাদন ও অনুপূরণ প্রচেষ্টা।

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে।
আমার মাঝারে তোমারে করিয়া দান॥"

—রবীন্দ্রনাথ।

এই গেল স্থূল রূপের কথা—সমাজ ধর্ম্মের কথা—সেবা ধর্ম্মের কথা ( Social Service ).

প্রবৃত্তি ও সাধন ভেদে, নিজ নিজ সাধনের ধনের সহিত উক্ত পঞ্চ বাগে সম্বন্ধ পুষ্টিই নিকষ ধর্ম্ম ও পরমার্থের কথা।

ধর্ম্মপন্থী সাধরণতঃ দুই স্তরের,—শাস্ত্রবাদী ( Dogmatic ) ও যুক্তিবাদী ( Rationalist )। যুক্তিবাদীর মধ্যে কেহ কেহ আবার নিরীশ্বর বাদী ( Atheist ) ও অজ্ঞতাবাদী ( Agnostic )। উক্ত ধর্ম্মপন্থিগণের সকলের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মূল মন্ত্র—"ধর্ম্ম-উদ্ধারণ।" শাস্ত্রবাদীর ধর্ম্ম তাহার শাস্ত্র সঙ্গত—"উদ্ধারণ।" ভগবান যে যে রূপে অবতীর্ণ বলিয়া লিখিত, সেই রূপের নাম উচ্চারণ, কীর্ত্তন, সাধন ইত্যাদিতে "উদ্ধারণ" লাভ। যুক্তিবাদীর ধর্ম্ম উপরে সংক্ষেপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞতাবাদীর কর্ম্ম,—সেবা ( Social Service ); ইহাও পঞ্চ ভাবে রূপের সেবার কথা।

এই মহা সত্য প্রচারকের ঘাড়ে অবতারত্বের বোঝা যাঁহারা চাপাইয়া দেখিতে চান—কিরূপ সাজে, তাঁহাদের হাত বড়ই বড়!

শ্রীজগদ্বন্ধু বাক্-চলচ্ছক্তি-রহিত পীড়িত নহেন বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কেহই ১৭ বৎসর ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যবসা করে নাই। জগদ্বন্ধুর কোন মন্ত্র-শিষ্য নাই এবং মন্ত্র তাঁহার সাধনার অঙ্গ নহে।

মানব মনে রূপের ও অরূপের সাধনা ফুটিয়া উঠিয়া অবধি মানব কখন কখন সামান্য রূপ ও নিজ নিজ [illegible] ( heredity and knowledge )

অনুযায়ী আপনার সাধনার ধন খুঁজিয়া লইয়া থাকে ; সেই সাধনা ভুল কি নির্ভুল, এই বিচিত্র বৈষম্যময় রূপ-মহাসমুদ্রের কোন্ রূপ, তাহার নিরাকরণ করিতে পারিয়াছেন ? বা—নিরাকরণ করিতে পারিলেও যুগপৎ নিবারণ করিতে পারিয়াছেন ?

তথা-কথিত "মহানাম সম্প্রদায়" যদি অসত্যের আশ্রয় না লইয়া, অনন্যভাক্ হইয়া শ্রীজগদ্বন্ধুকে ভজনা করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা আমার মাথার মণি হইতেন।

"যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

—গীতা, ৯ম। ২৩॥

---

# কায়স্থের অভ্যুদয়।

( শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ )।

পলাশীর আম্র কাননে যে দিন বঙ্গদেশের রাজলক্ষ্মী হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমাদের দেশের পক্ষে যে কত বড় স্মরণীয় দিন, তাহা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব ; ইংরেজ বণিক সেই দিন হইতেই প্রকৃত পক্ষে দেশের রাজা হইলেন এবং তাঁহাদের বিলাতী সভ্যতাকে আমাদের সমাজে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন ;—বিলাতী শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে আমরা দিন দিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

অনেক ইংরেজ এবং এদেশী "পণ্ডিত"-লোকের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গলার কায়স্থ জাতি পূর্ব্বে, নিতান্ত নগণ্য ছিল এবং নূতন বিলাতী সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া তাহারা একেবারে "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইয়া উঠিয়াছে,—অর্থাৎ পূর্ব্বে—ঘোষ, বসু, মিত্র, দেব, দত্ত, পালিত প্রভৃতি নিতান্তই কদাকার

"লোহা" ছিল, কেবল ইংরেজী শিক্ষারূপ পরেশ পাথরের সংস্পর্শেই তাহারা নির্ম্মল ও নিখুঁত সোনা হইয়া পড়িয়াছে; অধিকন্তু এই জন্যই এখন হাইকোর্টের বেঞ্চে এবং বারে, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, ডাক্তারের তালিকায়, ব্যবসায় ব্যাপারে—অর্থাৎ সর্ব্বত্রই,—ঘোষ, বসু, মিত্র, পালিত, সরকার, সর্ব্বাধিকারী, সিংহ, রায়, দত্ত, গুহ প্রভৃতির ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। এরূপ কথাও অনেকে বলেন যে, পূর্ব্বে যাঁহারা গ্রাম্য গুরু মহাশয় অথবা গোমস্তাগিরি,—না হয় সহরে বাজার-সরকারী করিতেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা লাট সাহেবের সভাসদ, জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হইয়া বাঙ্গলার সকল জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন,—এমন কি, খাস বিলাতী "লর্ড" পর্য্যন্ত হইয়া গেলেন,—ইহা কেবল ইংরেজী শিক্ষার ফলেই; এবং ইংরেজী শিক্ষায় "কায়েত"কে সত্যই "মানুষ" করিয়া দিয়াছে।

অন্যের কথায় কাজ কি,—স্বয়ং কুলীন-কায়স্থ-কুল-কমল, ভূ-ভারতে বিশেষ বিখ্যাত স্বয়ং মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ, গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে খাস লণ্ডন সহরের এক বিদ্বজ্জন পরিষদে বেশ স্পষ্ট ভাষায় ও পরিষ্কার সুরে বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীরা কোন কালেই যে লড়াই করিতে পারিতেন,—অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার শক্তি বা উদ্যম অথবা বীরের কোন গুণ যে তাঁহাদের স্বভাবে ছিল,—তাহা কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় (অর্থাৎ গো-বেচারী) জাতি; কিন্তু যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লড়াই বাধিয়া গেল, তখন সেই 'অ-লড়ায়ে' বাঙ্গালীর দল অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং ইংরেজসম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ ভূমিতে, যে কোনও কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।'* হায়! হায়! মহা মাননীয় শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় বয়সে এবং বিদ্যায় প্রবীণ হইয়াও ভাবিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন যে, কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যের উৎপত্তি হয়!—যদি

---

"* * * * Bengalees had not displayed any war-like qualities in their character. They were peaceful and peace-loving people, but when war broke out in 1914, the unwar-like Bengalees came forward and offered their services in any capacity to fight for the British......"—Quoted from report of his speech.

লেখক।

বাঙ্গালী জাতির তৈল-চিক্কণ, সুমসৃণ এবং সুকোমল চর্ম্মের নিম্নে বীরের কঠিন বর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে কি সে কখনও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালের সেই সমর-ভেরীর ভৈরব নাদে নাচিয়া উঠিত, না—সে জাতির নধর কোমল তরুণ বয়স্ক বালকগণ দলে দলে আসিয়া রণচণ্ডীর পূজায় যোগ দিতে ছুটিত? বড়ই দুঃখ হয় যে, বিজ্ঞ বসুজ মহাশয়, এই সেদিনের লক্ষ্মণমাণিক্য, রামচন্দ্র বসু, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং সীতারাম রায়ের বীরত্বের কথা একবারও মনে আনিলেন না! অধিক কি, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রেও সাত হাজারী মনসবদার বীর মোহনলাল যে কিরূপ বীর্য্যবত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহাও একবার ভাবিলেন না? কোন্নগরের "সোম" বংশীয় দশ হাজারী মনসবদার এবং তখনকার বাঙ্গলার নবাবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী রায় দুর্লভের সহায়তা না পাইলে পলাশীর সেই আম বাগানে ক্লাইবের কিরূপ অবস্থা হইত, তাহাও তিনি স্মরণে আনিলেন না? আমাদের সমাজের মাথার মণি, মহা মাননীয় প্রবীণ বসুজ মহাশয়েরও যদি এরূপ মতি হয়, তবে অপর সাধারণের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে?

স্বর্গগত সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠ, বাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র যে,—'বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই'—বলিয়া ক্ষোভ করিয়া গিয়াছেন,—এখনও তাহার কারণ দূরীভূত হয় নাই। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ,—এই দুই জাতির স্থান, সম্মান এবং প্রভাবের কথা সকলেই জানেন,—অথচ এই দুই জাতির প্রকৃত ইতিহাস এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। বঙ্গদেশে,—কায়স্থ জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে ক্ষাত্রশক্তির এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজস্ব ব্রহ্মশক্তির পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাই, আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইলেই এ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মনৈতিক সমুদয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

পাঠান-শক্তি যে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর উষাকালে, প্রবল বন্যার ন্যায় গৌড়বঙ্গ প্লাবিত করিয়া দিল, সে সময়ে এদেশের রাঢ় বিভাগের লক্ষ্মণাবতী নগরে সেনবংশীয় মহারাজ লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের হাস্যকর উপাখ্যান এখন দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত, তাহা আর নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবু, এই কথা মনে করা

নিতান্তই উচিত যে, এখনও মিথিলা প্রদেশে সেই কাপুরুষ আখ্যায় পরিচিত লক্ষ্মণসেন দেবের প্রতিষ্ঠিত সংবৎ—অথবা 'লসং'—প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভীরু অথবা কাপুরুষ ছিলেন না; পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং মগধে পাল বংশীয় কোন নরপতি তাঁহারই সামন্ত স্বরূপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের প্রদোষ কালে (১৪৯২—৯৮) প্রবল প্রতাপ পাঠান সম্রাট হোসেন সাহ পশ্চিম কামরূপের কমতাপুর দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়া, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অবরোধের পরেও বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন এবং তিনি জনৈক বিশ্বাসহন্তা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তা না পাইলে ও নিজে অতিশয় ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে, কখনই সেই কমতাপুর দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন না।* ক্ষুদ্র কমতাপুর দুর্গ সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল,—গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বিজয় ব্যাপারে তদপেক্ষাও যে অধিকতর কোন একটা ঘৃণিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল. তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

পাঠান বীর বক্তিয়ার খিলজীর পুত্র মহম্মদ (বক্তিয়ার খিলজী নহেন) কিরূপে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন,—মুসলমান ঐতিহাসিক তাহা লিখিয়াছিলেন এবং এখন বিদ্যালয়ে আমরা পুত্র-পৌত্রানুক্রমে তাহা পড়িতেছি। এখনকার উচ্চ সভ্যতার শীর্ষ স্থানীয় য়ুরোপীয় জাতিরা গত এক শত বৎসরের মধ্যে যত গুলি যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই যুদ্ধের ইতিহাস,—প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ্যমান জাতির ঐতিহাসিক কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ কৌতূহল-প্রযুক্ত রুস-ঐতিহাসিক এবং জাপ ঐতিহাসিকের লিখিত—"রুষ-জাপান" যুদ্ধের ইতিহাস একযোগে পাঠ করেন, তাহা হইলেই মানুষের হাতের তুলিতে লিখিত সিংহের এবং সিংহের হাতের তুলিতে অঙ্কিত মানুষের ছবির কথা মনে পড়িবে। আর যাহারা ভারতের বাহিরে যাইতে

---

* পাঠান-সুলতান তাঁহার নিজের স্ত্রী পরিবারবর্গ যাহাতে কমতাপুরের [illegible]পুরের ভিতর গিয়া রাজমহিলাগণকে অভিবাদন করিয়া আসিতে পারেন, তাহার অনুমতি লইয়া, অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবিকার ভিতরে অস্ত্রধারী সৈন্য পাঠাইয়া দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন।

অনিরুদ্ধ, তাঁহারা একবার মরাঠাসিংহ শিবাজীর সহিত মোগল-বাদশাহ আরঙ্গজেবের যুদ্ধের মুসলমানী ও মরাঠী বর্ণনা পড়িয়া দেখুন ; একই যুদ্ধ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক জাতির লিখিত" সমসাময়িক ইতিহাস পড়িলে উভয়ের পার্থক্য দেখিয়া পাঠককে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হইবে !" ইতিহাস ত দূরের কথা,—একই যুদ্ধের ফল যখন প্রচারিত হয়, তখন সেই একই ঘটনা সম্বন্ধে জেতা এবং পরাজিত উভয় পক্ষের দুইটী বর্ণনা পড়িলে কোন বর্ণনার উপরেই শ্রদ্ধা রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষ মাত্রেই—স্বার্থ, স্বজন ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ এবং শত্রুর উপর বিরাগ ও বিদ্বেষ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। তাই,—স্বদেশের ও স্বজাতির বিশেষ ভক্ত ভিন্ন "পরের" দ্বারা কোনও দেশের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না,—হইলেও তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, আমরা কায়স্থ জাতির অভ্যুদয়ের কথা বলিতেছিলাম। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল তৎপ্রণীত "আইন-আকবরী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৌড়বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবৎ কায়স্থ রাজারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আবুল-ফজল অবশ্যই যে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রাগুক্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সর্ব্বজন সুলভ "ইতিহাস" নামক পুস্তকে [illegible] আছে যে, বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় [illegible] ১২০৩ খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে,—অর্থাৎ প্রায় [illegible] পূর্ব খৃষ্টাব্দ ৭৯৭ খৃঃ পূঃ) এই গৌড়বঙ্গে কায়স্থ জাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে নাগবংশীয় অজাতশত্রু সম্রাটের সময়ে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রায় খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে (৪৮০ খৃঃ পূঃ) গৌতম বুদ্ধের জন্ম-কাল স্থির করিয়াছেন। বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, শিশুনাগ অথবা শেষনাগ নামক সম্রাটের বংশে নিশ্চয়ই অজাতশত্রুর নাম পাওয়া যায় এবং নাগ বংশের আরম্ভ মোটামুটি ৮০০ অথবা ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ধরা যাইতে পারে। পৌরাণিক এবং আধুনিক ইতিহাস মিলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মগধে ও

গৌড়বঙ্গে এই সময় হইতে নিম্নলিখিত রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন,—

(১) শেষনাগ বংশ অথবা শিশুনাগ বংশ (প্রথম বার)
(২) নন্দবংশ।
(৩) মৌর্য্যবংশ।
(৪) শুঙ্গবংশ, অথবা পুষ্প বা পুষ্য মিত্রের বংশ (প্রথম বার)
(৫) কণ্ববংশ।
(৬) অন্ধ্রবংশ।
(৭) পুষ্প মিত্রের বংশ (দ্বিতীয় বার)।
(৮) নাগবংশ (দ্বিতীয় বার)।
(৯) গুপ্তবংশ।
(১০) পালবংশ।
(১১) শূরবংশ।
এবং (১২) সেনবংশ।

ইহাদের মধ্যে কণ্ববংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ এবং অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের বর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে; কিন্তু অবশিষ্ট আর সকল বংশই বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় অথবা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় বংশ হইতে উদ্ভূত এবং ইহারাই পরে—"কায়স্থ" বলিয়া অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

উপরিস্থিত চক্রবর্ত্তী রাজগণ ভিন্ন এই দেশের স্থানে স্থানে নন্দী, চন্দ্র এবং গুহ উপাধিধারী রাজারা সামন্ত নৃপতি রূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন।'

শেষনাগ বংশ হইতে গুপ্ত বংশ পর্য্যন্ত রাজগণের বংশাবলী পুরাণ গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। নন্দীবংশ এবং গুহ বংশ সম্বন্ধেও পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা বায়ুপুরাণের ৯৯ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণের ৩৭৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পৌরাণিক প্রমাণ ব্যতীত লেখ্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। আমাদের পক্ষে সক্ষঃবলে

থাকিয়া লেখ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন; তথাচ যে কয়খানি পুস্তক দেখিতে পাইয়াছি,—তাহা নিবেদন করিতেছি।—

এলাহাবাদের বিখ্যাত স্তম্ভলিপি ( গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয় প্রশস্তি—( Gupta Inscription No. 1 ) ২১ একবিংশ পংক্তিতে আর্য্যাবর্ত্তের রাজ তালিকায় লিখিত হইয়াছে—

"রুদ্র-দেব-মতিল-নাগ-দত্ত-চন্দ্র-বর্ম্ম-গণপতিনাগ—নাগসেনা-চ্যুতনন্দি বল-বর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজ—" ইত্যাদি

ইহার মধ্যে "গণপতি নাগ" এবং "অচ্যুত নন্দী" এই দুইটী ব্যক্তিগত নাম এবং রুদ্র, দেব, মতিল, নাগ, দত্ত, চন্দ্র, বর্ম্ম, নাগ-সেন, বল এবং বর্ম্ম—এই কয়েকটী রাজার উপাধি মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এতদ্ব্যতীত কেদারপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন ( ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের "প্রতিভা", ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ) হইতে (১) পূর্ণচন্দ্র (২) সুবর্ণচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও (৪) শ্রীশচন্দ্র—এই চারিজন 'চন্দ্র' উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে এবং ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ( কলিকাতার "সাহিত্য-পরিষৎ" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত ) এক শিলালেখে 'নন্দী' উপাধিধারী কয়েক জন রাজার ( অথবা ভূস্বামীর ) প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। আর, বাঁকুড়ার বিখ্যাত শুশুনিয়া পর্ব্বতে কোন "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজার এক অতি পুরাতন ক্ষোদিত-লিপি অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ভারত খণ্ডের নানা স্থানে শত শত শিলালেখ ও তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের পাঠ, অনেকগুলি বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের "নির্ণয়সাগর" নামক মুদ্রাযন্ত্র হইতেও কয়েক খণ্ড পুস্তকে এইরূপ লেখাদি মুদ্রিত হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতেও 'লেখাবলী' নামে এইরূপ একটী সংগ্রহ বাহির হইয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার সাহায্য হইতে পারে, এরূপ ভাবে টীকা-টিপ্পনি পাঠান্তরাদি সহিত, ( অথচ ন্যূন মূল্যে পাওয়া যায়

এরূপ একখানি সংগ্রহ এখন পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই ;—অথবা হইয়া থাকিলেও আমরা তাহা অবগত নহি। অথচ, এরূপ উপাদান না পাইলে আমাদের কায়স্থ জাতির অভ্যুদয়ের বিশ্বাস-যোগ্য কোন ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না।

"মৌর্য্যবংশে"র রাজগণের বর্ণ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে ঢাকার সাহিত্য-পরিষদের মুখ-পত্রিকা "প্রতিভা"য় (১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব—অথবা কায়স্থত্ব—প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত "আইহোলের শিলালিপি"তে (ভাণ্ডারকরের দক্ষিণাপথের ইতিহাস, ১৭ পৃষ্ঠা, ইংরাজী) খৃষ্টীয় ৫৬৭-৫৯১ খৃষ্টাব্দে উত্তর কোঙ্কন প্রদেশে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সী) মৌর্য্যবংশের রাজত্বের এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩২ অধ্যায়ে 'ময়ূর' উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। ফলতঃ, ধর্ম্মে জৈন এবং বৌদ্ধ হইলেও মৌর্য্যবংশ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন এবং বায়ুপুরাণে 'বন্ধু পালিত' এবং 'ইন্দ্র পালিত' নামক দুই "পালিত" উপাধিধারী মৌর্য্যবংশীয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। শুঙ্গ অথবা মিত্রবংশ যে ক্ষত্রিয় তাহা ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারও তাঁহার "দক্ষিণাপথের ইতিহাসে"র ২৪ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। শুঙ্গবংশে 'ঘোষ' 'বসু' এবং 'মিত্র'—এই তিন উপাধিই দেখিতে পাওয়া যায়। 'গুহ'দিগের সম্বন্ধে বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

"কলিঙ্গা মহিষাশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ যে।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ পালয়িষ্যতি বৈ গুহঃ ॥৩৮৬॥

বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়।

"কলিঙ্গমাহিষমহেন্দ্রভৌমান্ গুহা ভোক্ষ্যন্তি ॥৬২॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন নাগবংশের কথা পুরাণে এত স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তাহার পর, সমুদ্র গুপ্তের বিখ্যাত স্তম্ভলিপিতে যে রুদ্র, দেব, নাগ, দত্ত, নন্দী, চন্দ্র, বর্ম্ম, সেন, বল, ও বর্ম্ম উপাধিধারী রাজগণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই

লিখিত হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণের বিষয় পুরাণে সামান্য রূপে থাকিলেও তাঁহাদের শিলালিপিতে নিম্নলিখিত মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের নাম পাওয়া যায়। যথা—

শ্রীগুপ্ত (৩১৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ)
|
ঘটোৎকচ গুপ্ত
|
চন্দ্রগুপ্ত (১ম)
|
সমুদ্র গুপ্ত
|
চন্দ্রগুপ্ত (২য়)—(৪১২ খৃঃ)
|
কুমার গুপ্ত ইত্যাদি

এবং এই বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৪১২ খৃষ্টাব্দ) কোন কোন পণ্ডিত কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গদেশের কায়স্থগণের মধ্যে এখনও বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দে, দত্ত, নাগ, পাল, পালিত, সিংহ, সেন, শূর, বর্ম্ম, গুপ্ত, নন্দী, বল ও চন্দ্র প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উঁহারা কুলীন, মৌলিক, মধ্যলা, মহাপাত্র, অচলা অথবা বাহাত্তুরে যে কোন আখ্যায় অভিহিত হউন না, এক কালে যে তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন এই যে—কীর্ত্তি, যশ, ক্ষেম, বসু, গুণ, ইন্দ্র, সোম ইত্যাদি "বল প্রকাশক" উপাধি কায়স্থদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বেরই পরিচায়ক।

স্থানাভাব বশতঃ, এই বিষয় লইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যতদূর দেখা গেল, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, কায়স্থগণ প্রায় তিন সহস্র বৎসর হইতে গৌড়বঙ্গে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং প্রকৃত পক্ষে মোগল সম্রাটদিগের সময়েই তাঁহাদের রাজত্বের অবসান হইয়াছে। কায়স্থ জাতির অভ্যুদয় নূতন ঘটনা নহে,—উহা বহু পুরাতন।

প্রকৃত হীরক ভিতরে ছিল বলিয়াই, ইংরাজী শিক্ষার "পালিসে" তাহার এত উজ্জ্বলতা দেখা যাইতেছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"ন প্রভা তরলজ্যোতিরুদেতি বসুধা তলাৎ।"

—·—·—

# লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।*

( শ্রীদেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত )।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই,—মহারাষ্ট্রীয়-গগণে যে প্রতিভার অরুণ উদিত হইয়াছিল, পূর্ণ ৬৪ বৎসর কাল সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়া গত ১লা আগষ্ট তাহা অস্তাচলশায়ী হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মানুষ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাই গ্রহণের দিন কৃষ্ণবর্ণ কাচের সহায়তা গ্রহণ করে।—এই পুরুষ-প্রবর যতদিন কর্ম্মশীল ছিলেন, ততদিন আমরা তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তিটী ঠিক দেখিতে পাই নাই। আজ যে তাঁহার অতীত আলেখ্য খানি দেখিতে চেষ্টা পাইতেছি,—এও আমাদের মনের কৃষ্ণ কাচের সাহায্যে। আমাদের মলিন কাচে সে মূর্ত্তিটীর অবিকল প্রতিরূপ ধরা পড়িতেছে না; শুধু আমরা নহি,—রাজপুরুষগণও এই দৃষ্টির কালিমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তাই, পুনঃ পুনঃ অভিযুক্ত হইয়া এবং অর্থদণ্ড, কারাবাস ও নির্ব্বাসন ভোগে লোকমান্য তিলকের জীবনে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ। লোকচক্ষু ঝলসিত করিয়া সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এখনও দৃষ্টির আবিলতা দূর হয় নাই, এখনও তিলকের স্বরূপ উপলব্ধির সময় আইসে নাই।

মানব নিবহের মধ্যে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা জীবনে কখনও জটিল

---

* গত ১৭ই শ্রাবণ, ফরিদপুর টাউন থিয়েটার হলে শোক সভায় পঠিত। সম্পাদক।

বাক্র পথ অবলম্বন করেন না; সম্মুখে বিরাট বাধা দর্শনেও যাঁহাদের জীবন-স্রোত কুটিল বা প্রচ্ছন্ন পথে প্রধাবিত হয় না। সুদৃঢ় মেরুদণ্ড, সত্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি, কর্ত্তব্যে অচল অটল হিমালয়বৎ সেই মহাপুরুষগণ সংসারের বুকে এক একটী গভীর সরল রেখা আঁকিয়া চলিয়া যান। কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন, দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতা,—কিছুতেই তাঁহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না।

বাঙ্গলা দেশে আমরা এমনই একটী লোক-পিতাকে পাইয়াছিলাম। মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে সে পুরুষ সিংহের জন্ম। তাঁহারও ললাটে যুগের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, দানস্রোতে বাঙ্গলা প্লাবিত, দৃঢ়তায় হিমাচল পরাজিত, মহত্ত্বে দেবলোক ম্লান হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালি! সেই বিদ্যা-সাগরের মৃত্যুর দিন স্মরণ কর। সেই যে শোকের ঝটিকা বহিয়াছিল, তার পর ভারতে অন্যকার এ শোকের মত প্রগাঢ় শোকোচ্ছ্বাস আর বোধ হয় প্রবাহিত হয় নাই। আজ যাহা হারাইলে, কত দিনে কত যুগে—এ অভাব পূর্ণ হইবে? ভারত-মাতার বক্ষ আজ দীর্ণ, নয়ন অশ্রু প্লাবিত, বদনে গভীর কালিমা; তেত্রিশ কোটি স্বার্থপর, আত্মমগ্ন ও অকৃতজ্ঞ সন্তানের মৌখিক সান্ত্বনায় এ দারুণ শোকের নিবৃত্তি হইবে না; এ বিরাট শূন্যতা, এ হাহাকার,—বড় ভীষণ, বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল পুরুষগণের চরিত্র অনুধ্যান করিলে দেখা যায়, ঐ চঞ্চল কর্ম্ম-তরঙ্গ-মালার নিম্নদেশে একটী প্রশান্ত ভাবের সমাবেশ আছে; বেগবতী স্রোতস্বতীর একটী মৌলিক উৎস আছে। সাধারণতঃ লোকচক্ষু ঐ ভাব-রাজ্যের সন্ধান পায় না, ঐ মৌলিক উৎসটী দেখিতে পায় না। বাল গঙ্গাধর তিলকের জীবনের বিচিত্র গতি ও অদ্ভুত কর্ম্মগুলি বুঝিতে হইলে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণের কয়েকটি কথার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।—মহাপ্রয়ানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার অধরে, তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥'

ইত্যাদি।

ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, আমাদের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক এবং ব্যক্তিগত জীবন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে পুনরায়

সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের আকাশটীকে নির্ম্মল ও প্রশান্ত দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল।

তাঁহার জীবনের সমস্ত কর্ম্ম-পুষ্প গুলি ঐ আদর্শ দেবতারই চরণে উৎসর্গীত হইয়াছে। সে কর্ম্মগুলি কি এবং কেমন, সে বিষয় আপনারা সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন, লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছেন। অদ্যকার এ সভায়ও সে বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে; সে বিষয় আমি আলোচনা করিব না। তাঁহার নিবেদিত অর্ঘ্য দেবতার পদ প্রান্তে পেঁীছিয়াছে কি না তাহা জানিতে হইলে,—হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধুনদ তট হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত নরনারীগণের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ করিতে হইবে। প্রতি হৃদয়-মন্দিরে আজ তিলকের মূর্ত্তি, প্রতি মুখে আজ "তিলক মহারাজের" জয় গান;—জয় গানই বটে, সহস্র পরাজয়ের মধ্যেও সে আলোকের শিশু সকলকে জয় করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। এক বিদ্যাসাগর ভিন্ন, এরূপ সার্ব্বভৌমিকত্ব এদেশে আর কেহ কখনও লাভ করিতে পারেন নাই। এই জয়ের ইতিহাস তোমাকে বলিয়া দিবে, তাঁহার প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণ প্রান্তে পেঁীছিয়াছে কি না।

গভীর দুঃখে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়; ত্যাগ ও সেবায় জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিদ্যাসাগর কাঁদিয়াছিলেন, তিলকও কাঁদিয়াছেন; দারুণ যন্ত্রণা, অসহ্য মনস্তাপ,সংশয়ের সুতীব্র দংশন-জ্বালা সুবর্ণের সমস্ত মলিনতা বিদগ্ধ করিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব জ্যোতিতে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছিল। যে কিছু ছাড়িতে শিখে নাই, সে আবার লাভ করিবে কিরূপে?—যে ত্যাগ করিতে শিখে নাই, সে প্রাপ্তির আনন্দ ভোগ করিবে কেমন করিয়া?—এই ত্যাগের মহিমায় তিলকের ললাট উদ্ভাসিত, এই ত্যাগের গৈরিকে সে স্বদেশ-সেবকের সৌম্য মূর্ত্তিটী গরিমাময়। আজ সে মহান্ আত্মা ভারতের আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র ব্যাপৃত। তাঁহার নীরব ওষ্ঠাধরে আজ অশরীরি বাণী ঘোষিত হইতেছে—"ত্যাগ"—"ত্যাগ"—"ত্যাগ"। এস ভারতবাসি! নীরবে ঐ বাণীর অনুসরণ করি; ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে আমরা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হই।

সূর্য্য ডুবিয়া যায়—কিন্তু সায়াহ্ন গগণের রক্তিম মেঘ-শীর্ষে তাহার নির্ব্বাণ জ্যোতি রশ্মিটী রাখিয়া যায়। ভারত-গগণের উজ্জ্বল "তিলক" একেবারে মুছিয়া যায় নাই,—তাহারই শেষ আলোকে আর একটী মহান্ হৃদয় উজ্জ্বল

হইয়া উঠিতেছে। ঐ যে ভারত মাতার পাদপীঠ তলে—সরল প্রাণ, মহান্ হৃদয়,—আর একটী দেবশিশু ধ্যানস্থ। ঐ যে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। তিলকের মহান্ আত্মা ঐ হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। সত্য, ধর্ম্ম ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠায় ভারত আবার পবিত্র হউন। রাজদ্বারে নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করিয়া তিলক বলিয়াছিলেন—"There are higher powers that rule the destiny of things, and it may be the will of Providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by remaining free" —যে ভগবৎ-বিশ্বাস তিলককে সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদের মধ্যেও স্থির রাখিয়াছিল, সেই মঙ্গলময় তিলকের মহান্ আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

---

## পরগাছা।

(সামাজিক প্রস্তাব)।

(শ্রীরতিনাথ মজুমদার)।

আমাদের বাগানে একটী আমগাছ আছে। উহার আমগুলি অতি সুস্বাদু বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'ওলা';—অবশ্য বর্দ্ধমানের নামজাদা 'ওলার' সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানি না। আম গুলি যেমন মিষ্ট, আবার পক্কাবস্থায় হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে বলিয়া, একাধারে রসনেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের বড়ই তৃপ্তিকর ছিল। যাহা হউক, ছোট বেলা হইতেই আমি অন্যান্য আম-গাছের আম অপেক্ষা 'ওলাগাছের' আমের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম। একবার গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিলাম, কিন্তু সে বৎসর 'ওলার" সহিত বড় সাক্ষাৎ হইল না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, 'ওলার' আম ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল, এবার উহাতে ফল কিছুমাত্রও ফলে নাই। গাছটীও জীবিত,

অথচ ফল হয় নাই,—অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিল এবং উহার কারণ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। মনে করিলাম মহামতি নিউটন্—গাছ হইতে একটী 'আপেল' ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতের কত উপকার সাধন করিয়াছেন; আর আমিও এই আম হইতে কোন না কোন একটী আবিষ্কার করিয়া জগতে বিখ্যাত হইব। মহা আগ্রহে ও সোৎসাহে আম বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দূর হইতেই সেই গাছটী দৃষ্ট হইল, দেখিয়া যেন বোধ হইল, গাছটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে; বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া যেন গাছটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। মনে বড় আনন্দের উদয় হইল এবং মনে করিলাম, গাছটীতে এবার ফল না ফলিলেও আগামী বারে উহা হইতে প্রচুর ফলের আশা করা অসঙ্গত নহে। ক্রমে আমি বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম।

বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সকল আশা ভরসা একেবারে অন্তর্হিত হইল।—দেখিলাম গাছটীর সমস্ত শাখা প্রশাখা গুলি ম্লান ও তেজহীন, পত্রগুলি বিবর্ণ ও অর্দ্ধ শুষ্ক কিন্তু উহার প্রতি শাখা হইতে এক প্রকার উদ্ভিদ বহির্গত হইয়াছে। উহাদের যেমন তেজ, তেমনি শ্রী এবং ঐ উদ্ভিদগুলি পত্র, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত। আম গাছের ডালের কতকাংশ সহ ঐ সকল পরভোজী উদ্ভিদগুলি উচ্ছেদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে বসিয়া আছি। আমার উপর ভিক্ষা বিতরণের ভার পড়িয়াছে। দেখিলাম,—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, কত আসিতেছে ও ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে, সহসা তাহার সংখ্যা করা যায় না; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্মক্ষম, কেহ কেহ বাস্তবিক কর্ম্ম করিতে অক্ষম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অলস, অনায়াস-লব্ধ আহার সংস্থানের উপায় পাইয়া শ্রম সাধ্য কোন কার্য্য করিতে একেবারেই স্বীকৃত নহে। তখন তাহাদের ভাব গতি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত আম্র বৃক্ষের কথা আমার মনে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কথা, সমাজের কথাও মনে উদিত হইল। মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ হেন বিশাল আম্রবৃক্ষও সামান্য

কতকগুলি পরপোষ্য ক্ষুদ্রাকার উদ্ভিদ শিশুর আহার সংস্থান করিতে গিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে এবং কিছু দিন পরে আর ঐ আম্র বৃক্ষের বোধ হয় অস্তিত্বও থাকিবে না।—তবে যে সমাজে এতগুলি কুপোষ্য প্রতিপালিত হইতেছে, সে সমাজের শক্তি কত দূর? মনে করিলাম, এই ভিক্ষুকদের অধিকাংশই ইচ্ছা করিলে কার্য্য করিয়া সংসারের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে। সমাজে লোকের কত অভাব, অথচ ইহারা জলৌকার ন্যায় পররক্ত-ভোজী। নিয়ত এত রক্ত দান করিয়া সমাজ আর কত দিন জীবিত থাকিবে?

ভিক্ষুকদের জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমরা এই নীচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন কর না কেন?"—আমার কথায় মুসলমান ভিক্ষুকগণ উত্তর করিল,—"মহাশয়, বলিব কি? আমরা জাত-ফকির, ভদ্রবংশে জন্মিয়াছি, আমরা কি কোন রূপ কাজ করিতে পারি?"—হিন্দু ভিক্ষুকগণ উত্তর করিল,—"আমরা চৈতন্যের ভেকধারী, আমাদের কি কাজ করিতে আছে?"—ভিক্ষা-বৃত্তি হইতে আর নীচ কাজ নাই, প্রমাণ করিতে আমি বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা হইল। "চোরা নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী"র ন্যায় উহারা আমার বাক্যে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ভিক্ষান্তে বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে অন্য গৃহস্থের দ্বারে গমন করিল।

আমার পার্শ্বে আমার পূজ্য এক বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তিনি যেন আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—"সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য যাহারা অপার্থিক হরিনাম বিতরণ করে, তাহারা কি সমাজের কম উপকারী?"—আমি উত্তর করিলাম—"কই?—উহারা একজনও তো ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিল না! পূর্ব্বে উহারা হরি বা আল্লার গুণ কীর্ত্তন করিত, কিন্তু এখন তাহা বড় শুনা যায় না। আর উহারা লোককে ধর্ম্মোপদেশই বা কি দিবে? উহারা লেখাপড়া জানে না, এমন কি প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ। উহারা জানে,—উহাদের ভিক্ষা দিতে যেন সকলেই বাধ্য। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে উহাদের অধিকাংশেরই যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। আজ কাল সমাজে পরিশ্রমী ব্যক্তির অত্যন্ত অভাব।

অনেক গৃহস্থ, চাকর চাকরাণীর অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং নিজে নিজে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও যথাযথরূপে সংসারের কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারেন না। যাহারা কায়িক শ্রমের উপযুক্ত, তাহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি পরিশ্রমী গৃহস্থের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখুন,—ভগবান ইহাদের হাত পা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন কি পরের শক্তিতে উদর পূর্ণ করিবার জন্য?—এই গ্রামে চারি হাজার লোকের বাস; তাহার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও কর্ম্মে অসক্ত লোক গুলি বাদ দিলে, বাস্তবিক কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক হয় না। এই দেড় হাজারের মধ্যে যদি ৩০০ ভিক্ষুক হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ লোককে পরিশ্রম করিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ করিয়া, আরও ২৮০০ লোকের ভরণ পোষণ করিতে হয়,—অর্থাৎ—প্রতি লোক, তাহার নিজের ভরণ পোষণ বাদে, আরও প্রায় ২॥ জন লোকের ভরণ পোষণের উপায় করিয়া দেয়। যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার অন্তঃসারশূন্য, সে সমাজের সাফল্য কতদূর সুদূর-পরাহত, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"

আজ কাল আমাদের পল্লী সমাজের অবস্থা যেমন হীন হইতে হীনতর হইয়া উঠিতেছে এবং ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাবে দিন দিন পল্লী-বাসীগণ যেরূপ প্রপীড়িত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে পূর্ব্বকালের পল্লীবাসীর সমস্ত সুখ সুবিধা গুলিই ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; পক্ষান্তরে—জলাভাব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি অভাবগুলি দল বাঁধিয়া তথায় চির বাসস্থানের চেষ্টায় আছে। এমন অবস্থায়, এখন পল্লীবাসীদের পক্ষে ঐরূপ ভাবে দান করিয়া আলস্যের সজীব মূর্ত্তিগুলিকে রক্ষা করিবার শক্তি কোথায়? যদি কোন ব্যক্তি,—এই নিষ্কর্ম্মা, পররক্ত-লোভী ও আলস্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত উপদেশ দানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা এই অধঃপতিত সমাজের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিব।

———

# শ্রাবণের ধারা।

( কুমারী শ্রীপূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ। বয়স—৯ বৎসর )।

ত্যজি' ধরা সপ্ত সিন্ধু উঠি' কি আকাশে,
বর্ষিছে অজস্র বারি দারুণ আক্রোশে।
চমকে চপলা ঘন ধাঁধিয়া নয়ন;
শ্রবণ বধির শুনি বারিদ গর্জ্জন।
বৃষ্টি সহ অবিরল পূর্ব্ব বায়ু বয়,
শঙ্কাকুল জীবগণ না দেখি উপায়।
কাজকর্ম্ম বন্ধ সব, শ্রমজীবী দল
না হেরি উপায় তা'রা হইল বিকল।
না জানি এ ঘোর বর্ষা কবে ছুটে যাবে
রবির উদয়ে ভবে, জীব শান্তি পাবে।
রাখ সৃষ্টি নারায়ণ! রাখ ঘোর দায়,
'পূর্ণিমা' তোমার পদে এই ভিক্ষা চায়।

---

# আমিষ ও নিরামিষ।

( শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় )।

সল্ট্ সাহেব ( Henry S. Salt ) বলিয়াছেন,—"মানবের শারীরিক গঠন ও করুণ হৃদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানব—স্বভাবতঃই সঙ্গপ্রিয় প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; এবং স্ব স্ব স্বভাব অতিক্রম করিলেই মানব জাতি হিংস্র পশুগণের শ্রেণীতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। শোণিত পাতে মানবের যে স্বভাবসিদ্ধ ভীতি,—সে ভীতি কেবল বহুকাল ব্যাপী সংস্কার দ্বারা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে না; যাহা শত শত বর্ষ ব্যাপী কু-অভ্যাসের পরও মানব হৃদয়ে প্রবল রহিয়াছে,—তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত করে যে, মানবগণ শোণিতাক্ত আমিষ ভোজনের উপযুক্ত নহে। প্রাণীবধ-রূপ কার্য্য অতি ঘৃণার্হ;—সুতরাং অপরের সাহায্যে প্রাণীবধ পূর্ব্বক সুন্দররূপে উহার মাংস রন্ধন করিয়া, অসদৃশ চির-

সত্যকে গুপ্তরাখিয়া চিন্তাশীল মানবগণও আমিষ ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। যদি মানব জাতির আমিষই স্বভাব-জাত নিরূপিত খাদ্য হইত,—তাহা হইলে বাগানের সুপক্ক ফল দেখিলে মানবের যে প্রকার স্বাভাবিক রুচি বা লোভ হয়, —কসাই-খানাতে মাংস দেখিলেও তাহার সেইরূপ আনন্দ হইত এবং উক্ত কসাইখানাও ফলোদ্যান সদৃশ রুচিকর হইত, সন্দেহ নাই।”

সুতরাং এখানে দেখা যায়,—আমিষ কখনও মানব জাতির স্বাভাবিক খাদ্য নহে, কিম্বা আমিষ পরিত্যাগ করিলে কোনও চির-সত্যকে গোপন বা প্রকৃতির কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। বহু বর্ষ হইল, মানব স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণ্য আমিষ-ভোজী হিংস্র জন্তুগণের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন—যদি আমিষ মানবের খাদ্য না হইবে, তবে এত বর্ষ কাল মানব জাতি তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারিতেছে কেন? আমিষ ভোজনের সমর্থন করিয়া ডাক্তার উইলসন্ ( Dr. Wilson ) সাহেব বলিতেছেন,—“আমাদের মানব জাতির দেহের সহিত প্রাণী-দেহ-জাত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং উহা আহার করিলে সহজেই জীর্ণ হইয়া আমাদের দেহ বলিষ্ঠ করে।”—যদি এই সাহেবের উক্তিই সত্য হয়, তবে মানব জাতি ব্যাঘ্রাদি পশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণের পর হইতেই অত্যন্ত মাংস-লুব্ধ হইত এবং অসিদ্ধ মাংসও তাহাদের একটী প্রীতিকর খাদ্য হইত।

নিরামিষাশিগণের পক্ষ হইতে Richardson সাহেব বলিতেছেন,—“From experimental observations which I have made, I am of opinion that the vegetable flesh-forming substances may be easily digestible, when they are presented to the stomach in proper form, as are the animal substances of like quality”—বাস্তবিক উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য যদি উপযুক্ত ভাবে পাকস্থলীতে প্রদান করা যায়, তবে হইলে মাংসজ খাদ্যাপেক্ষা উহা সহজেই জীর্ণ হইতে পারে; [illegible] যদি [illegible] অধিক ভোজন করা যায়—উহা সুচারুরূপে জীর্ণ করিতে আমাদের ততই কষ্ট পাইতে হয়। *

* আমিষ কিম্বা নিরামিষ ভোজন প্রশস্ত তৎসম্বন্ধে বহু দিবস যাবৎ বিভিন্ন দেশে তর্ক চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (টেনারী,

যাঁহারা আমিষ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা লুব্ধ হইয়া শরীর রক্ষার্থ যে পরিমাণ যবক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক ভোজন করেন ; কিন্তু যাহারা শুধু নিরামিষ, ভোজন করেন, তাহাদের পক্ষে তাহা হইতে অধিক হইতে পারে না। উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে আমরা যথা-প্রয়োজনীয় যবক্ষারাদি প্রাপ্ত হইতে পারি এবং উহা আমিষের যবক্ষার হইতে অতি সহজে পরিপাকও হয়—সুতরাং তাহাদ্বারা শরীরের কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হয় না। নিরামিষাশী—আমিষ ভোজী হইতে অধিক বলশালী হয় ;—যদি কোথায়ও আমিষ ভোজীকে নিরামিষাশী হইতে অধিক বলশালী দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে—খাদ্য ব্যতীত, দেশের

---

তাজগঞ্জ, আগ্রা) প্রণীত "খাদ্য চিত্র" হইতে যাহা পাঠ করিয়াছি নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল। (এই খাদ্য চিত্র আমরা প্রত্যেককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রাপ্তিস্থান—এম্, ধর। ৪৯।২এ, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

নিত্য কার্য্যের সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আমাদের শারীরিক উপাদানসমূহ নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ; Hydrogen, Oxygen, Carbon এবং Nitrogen—এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান। শরীর পুষ্টির জন্য উপরোক্ত উপাদানসমূহের অপচয়ের অনুপাতে আহার্য্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। চারি প্রকার উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য দেহরক্ষায় বিশেষ আবশ্যক—

(১) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয়।—চাউল, ময়দা, গোল ও মিঠা আলু, মিঠা কুমড়া, চিনি।—মাংস ও মৎস্যে এই উপাদান নাই।

(২) তৈল জাতীয়।—ঘৃত, তৈল, মাখন ও নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি।

(৩) ছানা-জাতীয়।—দুধ, ছোলা, মটর, সিমদানা, ডাইল, মাংস ইত্যাদি।—মাংস ও দুধে এই উপাদান (Nitrogenous componnds or Proteins) আছে ; কিন্তু ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাইলে ইহা আরও অধিক পরিমাণে আছে।

(৪) লবণ জাতীয়।—আমিষ পদার্থে অল্প মাত্রায় আছে ; শাক, ফলমূল প্রভৃতি তরকারীতে অনেক আছে।

পাঠকগণই ইহা হইতে বিবেচনা করিবেন,—আমিষ কিম্বা নিরামিষ ভোজন প্রশস্ত।

সম্পাদক।

জল-বায়ু, সমাজগত বা জাতিগত সংস্কার প্রভৃতি অন্যান্য কারণেই ঐরূপ হইয়াছে। আমিষাশী-বঙ্গদেশবাসী হইতে পশ্চিম দেশীয় নিরামিষাশিগণ অধিক বলশালী হইতে দেখা যায়।

নিরামিষ ভোজনে যে প্রকার শারীরিক বল হয়,—সেই রূপ মানসিক বলও প্রখর হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে Dr. Haig সাহেব বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন—"My researches show not only that it is possible to sustain life on products of the vegetable kingdom, but that it is infinitely preferable in everyway and produces superior powers both of mind and body."

ফাওলার ও জ্যাকসন্ প্রভৃতি ডাক্তারগণের এই প্রকার মত:—যদি কেহ নিজ সন্তানকে অশান্ত, কলহ-প্রিয়, ক্রূর-স্বভাবপন্ন, প্রতিহিংসা-পরায়ণ,ঘৃণার্হ, পরদ্বেষী এবং হিংস্রজন্তু সদৃশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে অধিক পরিমাণে মাংস ভোজন করাইতে হইবে; কিন্তু যদি তাহাকে মেষ-শিশুবৎ; নিরীহ ও পূত ভাবাপন্ন করিতে ইচ্ছা থাকে,—তাহা হইলে তাহাকে অধিক পরিমাণে নিরামিষ ভোজন করাইতে হইবে।—ডাক্তার জ্যাকসন সাহেব বলিয়াছেন,—গোমাংস জীর্ণ হইয়া শোণিতে পরিণত হইতে থাকিলে শরীরের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে উহাদ্বারা উত্তেজনারও আধিক্য হয়; এবং ইহাতে মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও হৃদপিণ্ড উত্তেজিত হইয়া আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহার প্রতিশেধক স্বরূপ মদ্য জনিত উত্তেজনার (alcoholic stimulant) আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমাদের মন্বাদি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে আমিষকে রাজসিক ও তামসিক খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমিষ ভোজনে সত্ত্বগুণ দূরীভূত হইয়া রজো ও তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং যে আমিষ ভোজনে আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের উত্তেজনায় এতখানি কুফল আনয়ন করে,—সেই আমিষ ভোজন বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। কোথাও কোথাও আমিষ ভোজন সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নিষেধই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থানে মনু বলিয়াছেন,—যজ্ঞাহুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায়; ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে, যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইয়া, (ব্যাধিহেতু বা খাদ্যাভাবে) প্রাণ যায়

এমন সঙ্কট কালে মাংস ভক্ষণ করিলে কোনও দোষ নাই।—কিন্তু অন্যত্র পার্ব্বতী বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ কিংবা আমার বা অপর কোনও দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, জীব হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে, সে নিত্য নরকপ্রাপ্ত হয়।

---

# হরীতকী।

## ( শ্রীজীবনবিহারী সিংহ )।

পূর্ব্বানুবৃত্তি,—শেষ।

হরীতকী হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরীতকী গাছের পাতা অনেক সময়ে গৃহ পালিত পশুগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এদেশে মুখশুদ্ধি করিবার জন্য অনেকে হরীতকী খাইয়া থাকেন। ইহার স্বাদ তিক্ত-কষায়, কিন্তু জল পান করিয়া হরীতকী মুখে দিলে, আমলকীর ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়।

হরীতকী বৃক্ষের আটা হইতে গঁদের ন্যায় এক প্রকার নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে। গোঁড় জাতিরা ঐ গঁদ সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। উহা বাজারে "বেয়াড়া" বা "বহেড়ার" আটা বলিয়া বিক্রয় হয়; ঐ গঁদের সহিত বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাসও থাকে।

যদিও পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ হরীতকীর গুণ অবগত ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী তদ্দেশবাসিগণ হরীতকী ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা হরীতকীর বিশেষ গুণ নিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্লেমিং এবং রস্‌বার্গ প্রমুখ ইয়োরোপীয় লেখকগণ বিবেচনা করেন যে, হরীতকী এক প্রকার নির্দ্দোষ কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ। বুকানন্ হ্যামিল্‌টন্ কহেন যে, ইহা যে শুধু ঔষধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে; চর্ম্ম সঙ্কোচন কার্য্যেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হরীতকী ফলের শাঁস জলে ভিজাইলে যে কস হয়, তাহা মলিন হরিদ্রাবর্ণ; উহাদ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। হরীতকী ও ফুলকুঁড়ীর পাত্‌ড়া ফট্‌কিরি যোগে জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে কাথ হয়, তাহা স্থায়ী ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ।

কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য যোগে বিভিন্ন বর্ণের কাল রং প্রস্তুত করিতেই হরীতকীর ব্যবহার অত্যধিক। লৌহ-লবণ (Salt of Iron) মাত্রেই, বিশেষতঃ Proto Sulphate যোগ করিলে, বর্ণ কাল হইয়া থাকে। কখন কখন রং গাঢ় করিতে সামান্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঢাকা অঞ্চলে হরীতকীর কসের গাঢ় রং কালো করিতেও Ferrous sulplate দিয়া থাকে। ছোট নাগপুরে Proto sulphate of Iron ও কুসুমফুল দিয়া 'কক্রেজা' নামক এক প্রকার সুন্দর রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে হরীতকীর সহিত তিরসুটী মিলাইয়া কাল রং করে। হরীতকীর সহিত কতক পরিমাণে Ferrous sulphate দিয়া খাকীর রং করা হয়। হরীতকী, বহেড়া ও টৌড়ী একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ হিরাকস্ দিলে উত্তম কাল রং হয়। ঐ জল কালী রূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে অল্পমাত্রায় নীল-বড়ি মিশাইলে ব্লুব্লাক্ কালী প্রস্তুত হয়। কখন কখন নীল ও হরিদ্রাযোগে সবুজ, নীল সংযোগে গাঢ় নীল এবং খদির সংযোগে পাটকিলা রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরীতকীর, রং পাকা করিবার শক্তি আছে। কুসুমফুল, আল্, মঞ্জিৎ, হল্দি ও তেসু প্রভৃতির রং পাকা করিতে হরীতকী, হিরাকস্ ও লৌহমাটী একত্র মিলাইয়া যে কৃষ্ণবর্ণ আঁটা হয়, তাহা জুতা ব্রাস করিতে আবশ্যক ও অশ্ব সজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তসর, কোরা, এণ্ডি বা পশম রং করিতে হরীতকীর ছাল, বাবলা শুঁটির সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিলাইলে, পর্য্যায় ক্রমে বিভিন্ন বর্ণ পাওয়া যায়। ইহার ফুলকুঁড়িতে ১৩.১ ট্যানিক্ এসিড্ থাকায় পশমে ফিকা হল্দে রং হইয়া থাকে।

বস্ত্রাদি অপেক্ষা চামড়া পরিষ্কার ও রং করিবার জন্যই হরীতকীর বহুল ব্যবহার; এবং এই কারণ বশতঃই হরীতকী পণ্যরূপে, সমুদ্র পথে, বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া থাকে।

হরীতকী সম্বন্ধে আরও আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারিত। প্রবন্ধ অযথা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং এই স্থানেই ইহার সমাপ্তি হইল।

———

(স্থানাভাবে এই সংখ্যায়—"বিবিধ" সন্নিবিষ্ট হইল না)। সঃ।

# গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ২৲ মাত্র ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বৎসরের যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু বৈশাখ সংখ্যা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন কারণে কাগজ না পান তাহা সময়ে না জানাইলে পরে মূল্য দিয়া কাগজ ক্রয় করিতে হইবে।

২। পত্রের উত্তর জন্য রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা।

---



---


ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ। [৮ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১৩২৭ সাল।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ।

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ফরিদপুর।

বার্ষিক মূল্য—২৲। এই সংখ্যা—৵০

# সূচীপত্র।

( প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী )

## অগ্রহায়ণ।

# আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

১৩শ খণ্ড। { অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল। } ৮ম সংখ্যা।


## মা আমার !


( শ্রীমুরারীমোহন কর বর্ম্মা, 'সারস্বতাশ্রম', চন্দননগর )।


"হৃদয় তোমারে ডাকিছে জননি
এ যাতনা কত সহিব আর
ডাকিতেছি:রোবে মা—মা বলিয়ে
নাশিবে নাকি গো দুঃখের ভার !"
স্বামীজী—— পদ্ম।

( ১ )

সুষমা শ্যামার সাধের কুঞ্জ
মলয় পবন বহিত
স্নিগ্ধ মনোরম সুমন. পুঞ্জ
তথায় আনন্দে নাচিত।
দেখিতাম আমি মূরতি তোমার
অনন্ত ফুলের হাসিতে,
শুনিতাম গানে পরভৃতিকার
সুস্বরে তোমায় ডাকিতে ;
হতশ্রী সেথা যে হয়েছে এখন ;
অনন্ত শোভায় আবার তেমন,
সাজায়ে শাশ্বত মাতাইতে মন,
এস মা আমার !

( ২ )

তব অবস্থান অভাব জন্য
বিভা যে গিয়াছে চলিয়া,
ভীতিপূর্ণ এক মহা অরণ্য
মাঝেতে আমারে ফেলিয়া,
আবলি আপাতঃ কোমল লতার
প্রবেশ করেছে ইহাতে,
সুরভি সহিত বায় সুমনার
আসে না হেথায় তাহাতে,—
নাশি উচ্ছৃঙ্খল পাদপ সম্ভার
নির্বায় প্রদেশ করিয়ে সংস্কার,
হতশোভা কুঞ্জ করিতে উদ্ধার,
এস মা আমার।

( ৩ )

হেথায় ঝটিকা সদাই যুদ্ধ
কবিয়া অরণ্য সহিতে,
পরাজিত তায়, হইয়ে ক্রুদ্ধ
পূর্ণ করে ধূলি রাশিতে।
দিব্য চক্ষু মোর অন্ধ শত বার
যায় যে দিবসে হইয়া
সদাই রিপুর আবলি আবার
বিকট গর্জ্জন কবিয়া,
ঘেরিয়া সকলে আসিয়া দাঁড়ায়
আমার অস্তিত্ব অবশি বা যায়,—
এ ঘোর বিপাকে রক্ষিতে আমায়,
এস মা আমার।

( ৪ )

বিলাস নিপুণ, বিপুল সত্ব
সদাই আবার এখানে

পাঁচ ভূত * যেন করে রাজত্ব
আমার লতার বিতানে,
স্বার্থপরতার, মূর্ত্ত অবতার
উদর সর্ব্বস্ব সতত
দ্বিগুণ শক্তিতে + উপর তাহার
মোর সত্ব নাশে চেষ্টিত,
তোমার চিন্তায় সদা প্রতিকূল,
সর্ব্বদাই করে পরাণে ব্যাকুল ;—
নাশিতে তাদের প্রভাব অতুল,
এস মা আমার।

( ৫ )

ভীষণ তাদের ছয়টা বিন্দু ‡
উৎফুল্ল প্রভাবে সতত,
সদা চায় তারা বিষয় সিন্ধু
মাঝেতে হইতে নিরত,
জলৌকার বৃত্তি করি অনুকার,
সতত শোণিত শোষিছে
আকর্ষিয়া সদা মতন ধরার
নীচু দিকে তারা টানিছে।
দূর নিম্নে ফেলি আঁধার গুহায়
বিচূর্ণ করিবে মোরে শতধায়,—
পিচ্ছিল পর্ব্বতে রক্ষিতে আমায়
এস মা আমার।

( ৬ )

উদ্দেশ্য বিহীন, জীবন শূন্য
তরঙ্গের মত সতত,

---

* পাঞ্চভৌতিক দেহ। + রজস্তমঃ।

‡ ষড়রিপু।

সাগরের সনে যেথায় শূন্য
মিলিত বলিয়া প্রতীত,
সেই দিক পানে, প্রভাবে বাত্যার
অজানা দেশেতে উঠিয়া
ধাই অন্তহীন, সাগর মাঝার—
অনন্ত খগণে মিশিয়া।
বলিদান দিয়ে নশ্বর বাসনা,
হৃদয়ে দেবতা করিতে ধারণা
শিখাতে আমায় আমার সাধনা,
এস মা আমার।

( ৭ )

হৃদয়ের শত তন্ত্রী বিচ্ছিন্ন
পড়িয়া জাগত দ্বন্দ্বেতে *
তনু মোর দেখ হয়েছে খিন্ন
বিরুদ্ধ পেষণ মাঝেতে,
পাপ পুণ্য দুটা কথা মাত্র সার
প্রাপ্ত হই বটে শ্রুতিতে,
কিন্তু জ্ঞানহীন হইয়াছি,—আর
পারি নাক কিছু করিতে।
সর্ব্বভূতময়! অনন্তবিলীনে,
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি, বিজ্ঞান বিহীনে,
মার্গ দেখাইতে এঘোর বিপিনে,
এস মা আমার।

( ৮ )

যোগনিদ্রা* দিয়ে তোমার বিশ্ব-
জুড়ান ক্রোড়েতে, বিভোর

---

* পাপ, পুণ্য; শীত, উষ্ণ; সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিরুদ্ধ যুগ্ম।

* আত্মার বিষয় চিন্তা ত্যাগরূপ নিদ্রা।

হইয়া সতত, অবিদ্যাবৃষ্য
শুষ্কযোগক্ষেম, * এ ঘোর
অন্ধকার-ময় গহন মাঝার
চেষ্টিব সাধিতে যতনে,
বিশ্বময় তুমি প্রমাণ তাহার
দিবারে আমার সাধনে,
"আমি তোমাময়!" † তুমিই কর্ত্তা,
তুমিই কারক, আমি ত ভৃত্য,
হইয়ে কৃপালু দেখাইতে নিত্য,
এস মা আমার।

( ৯ )

বুঝাও আমারে—করুণ ভিক্ষা
ত্রিগণ‡ তুমিই ভুবনে,
রহেছি, তোমারি করি প্রতীক্ষা
শ্বাপদ সঙ্কুল গহনে,
খুলিয়া সে দিন কুটীর দুয়ার
কৃতার্থ হইবে চিত্ত,
নৈবেদ্য কি দিয়ে চরণে তোমার,
অমূল্য আগত বিত্ত,
হৃদয় আমার ব্যতীত কি আর
সঙ্কটে রক্ষিতে সন্তানে তাহার,—
গ্রহণ করিতে পূজা-উপহার,
এস মা আমার।

---

* আধ্যাত্মিক অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি, প্রাপ্তের রক্ষা।

† 'তত্ত্বমসি সেত কেতো' ( উপনিষৎ ) বা 'সোঽহং'।

‡ ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ।

# মুদ্রা।

( শ্রীরতিনাথ মজুমদার )।

বোধ হয় সমাজ মধ্যে সভ্যতার প্রাথমিক রশ্মি পতনের সঙ্গেই মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, কারণ মুদ্রা—মানব সভ্যতার অন্যতর প্রথম সোপান। ভারতে কত দিন হইতে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই আমরা মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাই।

মানব সমাজে ধাতুর ব্যবহার প্রচলন হইবার পূর্ব্বে কড়ি বা তদনুরূপ পদার্থেই মুদ্রার কার্য্য চলিত। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সর্ব্ব প্রথমেই বোধ হয় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়া থাকিবে। বৈদিক সময়ে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারতের সময় স্বর্ণমুদ্রার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। সেই সময় ভুরি ভুরি স্বর্ণমুদ্রা দানের উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিধানে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কড়িরও ব্যবস্থা আছে। নিষ্ক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা; মনুসংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত বিধানে দেখা যায় যে, এত নিষ্ক বা এত কাহন কড়ি দান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় মনুসংহিতার কালে স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি—এই উভয়েরই প্রচলন ছিল। তখন বোধ হয় তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন তেমন ছিল না।

অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যেও বোধ হয় বহু পূর্ব্ব কাল হইতে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হইয়া থাকিবে। রোম, গ্রীক ও মিসরের ইতিহাসে অতি প্রাচীন কালেও মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়; আবার উপন্যাস শ্রেণীর গ্রন্থে বহু স্বর্ণমুদ্রার ছড়াছড়ি দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার দরহাম মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়,—এক প্রকার স্বর্ণ নির্ম্মিত ও অন্য প্রকার রৌপ্য নির্ম্মিত। প্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ, মহাকবি ফারদুসির একটী কবিতা পাঠ করিয়া বড়ই মুগ্ধ হন এবং কবিকে বলেন, তিনি সেইরূপ মধুর যতগুলি কবিতা শুনাইতে পারিবেন, ততগুলি দরহাম তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। তখন রাজ কার্য্যে স্বর্ণ

নির্ম্মিত দরহামের প্রচলন ছিল। কবি তাঁহার ৬০ বৎসর ব্যাপী রচিত ষষ্টি সহস্র সুন্দর কবিতা সম্বলিত 'সাহনামা' নামক প্রসিদ্ধ কাব্য সুলতান সমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান উক্ত কাব্য পাঠ করিয়া মোহিত হইলেন কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শে, কবিকে ৬০ সহস্র রৌপ্য দরহামের অনুমতি দিলেন। কবি ঘৃণার সহিত উক্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ ভবনে চলিয়া যান এবং নিরাশায় ভগ্নচিত্ত হইয়া তথায় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। পরে কিন্তু মামুদ নিজ ভ্রম হৃদয়াঙ্গম করিয়া কবির নিকট ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ দরহাম প্রেরণ করেন; কিন্তু মহাকবি আর ইহ জগতে সেই অর্থ উপভোগ করিবার অবসর পান নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল; পরে তাম্রমুদ্রারও উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দু রাজত্ব কালে রাজ-সরকারে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহারেরই এক চেটিয়া ছিল। সাধারণ লোকে কড়ির দ্বারাই সংসারের সাধারণ কার্য্য চালাইত এবং পরে তাম্রমুদ্রার প্রচলন হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যবহৃত করিতে আরম্ভ করে।

মহম্মদ ঘোরীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও ছলনায় দিল্লীরাজ পৃথ্বিরাজের পতন হয় এবং মুসলমানেরা দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ গুলির উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিনের পরই গোক্ষুর নামক এক প্রকার পার্ব্বতীয় দুর্দ্ধর্ষ জাতির কতিপয় ব্যক্তি বৈরী নির্য্যাতন মানসে, গোপনে সেই পররাষ্ট্র লোলুপ পৃথ্বিরাজ-বিজয়ী সাহেবুদ্দিনকে হনন করে। তখন তাঁহার ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার কয়েক জন দুর্ব্বল উত্তরাধিকারী ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ক্রমে তাঁহার জামাতা আলতামাস দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইনি এক জন বিচক্ষণ ও প্রবল নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং পল্লীগ্রামে কড়ির ব্যবহারেরও অভাব ছিল না। তিনি দেখিলেন, রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইতে হইলে, স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার মধ্যবর্ত্তী আর এক প্রকার মুদ্রা প্রচলন আবশ্যক। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য ১২৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলুতামাস মুসলমান-ভারতে প্রথম রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। সেই হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের

দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হয় নাই। আলতামাস-প্রবর্ত্তিত সেই রৌপ্য মুদ্রা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান প্রচলিত টাকার ন্যায় ওজনে বা আকৃতিতে এক প্রকার ছিল না। প্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট্ সের শাহ মোগল-সম্রাট্ হুমায়ূনের হস্ত হইতে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। তিনিই প্রথমে তাঁহার সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য জরিপ করিয়া উহার নূতন জমা-বন্দী করত সাম্রাজ্যের আয় ও শৃঙ্খলতার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি রৌপ্যমুদ্রাকে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার 'রূপিয়া' আখ্যা প্রদান করেন এবং উহার ওজন ১৭৯ রতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। মুসলমান রাজা-দের প্রচারিত রৌপ্যমুদ্রা শুধু গোলাকার ছিল না, অনেক সময় চতুষ্কোণ ও পঞ্চকোণ মুদ্রাও দেখিতে পাওয়া যায়।

পরে আবার মোগলেরা ভারতের অদৃষ্ট-নিয়ামক পাণিপথ ক্ষেত্রে পাঠানদের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, প্রবল প্রতাপে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত শাসন করেন। তাঁহাদের রাজত্ব কালে ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র—এই তিন প্রকার মুদ্রারই প্রচলন ছিল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ বণিকগণ মোগল রাজকর্ম্মচারীদের সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহাদের নিজ ব্যবহারের জন্য কৌশলে ইংরাজ রাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ইংরাজেরা এক টাকশালা স্থাপন করিয়া ইংরাজ-রাজের নাম সম্বলিত মুদ্রা প্রচলিত করেন; এই সংবাদ ক্রমে মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হয়। তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিতান্ত ক্রোধিত হইয়া সেই মোগল কর্ম্মচারীদের শাস্তি বিধান করেন এবং বোম্বাই নগর হইতে ইংরাজ বণিকদের প্রতিষ্ঠিত টাকশালা উঠাইয়া দেন। প্রবল-প্রতাপ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌স্ ইংরাজ বণিকদের ভারতে দেশী মুদ্রা প্রচলন করিবার আদেশ করেন। ইংরেজ বণিকগণ তৎকালীন দুর্ব্বল মোগল-সম্রাট ফিরোকসিয়ারের নিকট হইতে নানা উপায়ে ইংরাজের নামে টাকা প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পলাসী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ সালে কলিকাতা টাক-শালে প্রস্তুত মুদ্রা সর্ব্ব প্রথমে বাহির হয়। সেই বৎসরে মোগল-সম্রাট সাহ্ আলম অযোধ্যায় আগমন করেন। সেই সময় বাঙ্গলার নবাব মীর কাশেম

ইংরাজদের নিকট পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হন, ঘটনা ক্রমে তথায় দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম উপস্থিত ছিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট এবং অযোধ্যা ও বাঙ্গলার নবাবদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বক্সার নগরের নিকট মুসলমান ও ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। প্রবল যুদ্ধের পর ইংরাজেরা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তখন সম্রাট বাধ্য হইয়া ইংরাজদের বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী পদ প্রদান করেন। এই যুদ্ধের পর হইতেই পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মুসলমান-টাকশালা উঠিয়া যায় এবং কলিকাতা-টাকশালা হইতে ইংরাজ-রাজের নামে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বাহির হইতে থাকে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফরেক্কাবাদে টাকশালা স্থাপিত হয়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে পারম্পারিক একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির হয় এবং রৌপ্যমুদ্রা ওজনে ১৬ সিক্কায় পরিণত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান রৌপ্যমুদ্রা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের করদ-মিত্ররাজ্যগুলি নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মুদ্রা মুদ্রিত করিতেন, ঐ গুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ওজনের হওয়ায় ব্যবহারের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইত বলিয়া ক্রমে তাঁহাদের মুদ্রিত মুদ্রা উঠিয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ৩৪টী করদ ও মিত্ররাজ্যে তাঁহাদের জন্য উক্ত প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। ক্রমে উহার প্রচলন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

টগলক বংশে মামুদ নামে একজন অতি শিক্ষিত সম্রাট ছিলেন, কিন্তু নিজে শিক্ষিত হইলেও সকল সময়ে তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত না; অনেক সময় তিনি পাগলের ন্যায় এক একটী কাজ করিয়া বসিতেন। তাঁহার বিচার শক্তি প্রবল না হইলেও নিজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-শূন্য উদ্ভাবনী-শক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি এক সময়ে চীনদেশ জয় করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই, কেবল বৃথা চেষ্টায় তাহার রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। সেই শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন।—তিনি শুনিতে পাইলেন, চীনদেশে এক প্রকার

নোট প্রচলিত আছে,—তথায় রাজ্য মধ্যে ঐ নোট, টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। তখন তিনি নিজ রাজ্য মধ্যে এক প্রকার নোটের প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু রাজকোষের গৌরব না থাকায় কেহ উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল না; বিশেষতঃ বৈদেশিক বণিকগণ তো উহা একেবারেই গ্রহণ করিলেন না। ফলে, মুসলমান ভূপতির এই চেষ্টা একেবারেই ফলবতী হইল না। ইংরাজেরাই আমাদের দেশে নোটের প্রচলন করিয়াছেন; উহাতে বাণিজ্যাদিরও বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজেরা এ দেশে স্বর্ণ মুদ্রার মুদ্রণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন ইংলণ্ডে মুদ্রিত গিনিই—আমাদের স্বর্ণমুদ্রা। পূর্ব্বে গিনি গলাইয়া লোকে অলঙ্কার প্রস্তুত করিত, তাহাতে অনেক গিনি নষ্ট হইত। এই ব্যাপার নিবারণ কল্পে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচারিত করিয়াছেন; এখন কোন মুদ্রিত-মুদ্রা যে কোনও কারণ বশতঃ গলাইলেই তাহাকে দণ্ডার্হ হইতে হয়।

এখন আর আমাদের দেশে তাম্র মুদ্রার প্রচলন নাই, এখন ব্রোঞ্জ নামক এক প্রকার ধাতুর দ্বারা পয়সা প্রস্তুত কার্য্য চলিতেছে। আর নিকেল্ নামক এক প্রকার ধাতু দ্বারা এখন আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি প্রস্তুত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে রৌপ্য নির্ম্মিত টাকা, আধুলি, সিকি ও দুয়ানিরও প্রচলন আছে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। স্বর্ণে—গিনি, রৌপ্যে—শিলিং ও তাম্রে—পেনী ও হা-পেনী নির্ম্মিত হইত। এখনও গিনি—স্বর্ণে ও শিলিং—রৌপ্যে নির্ম্মিত হয় বটে কিন্তু পেনী ও হা-পেনী —ব্রোঞ্জ নামক ধাতুতে নির্ম্মিত হইতেছে। ইংলণ্ডে ৪০ শিলিং কিংবা তদধিক মূল্যের কারবারে, স্বর্ণ মুদ্রাই ব্যবহার করিতে হয়।

---

# জাতি বিদ্বেষ।

( শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা )।

অনেক সময় একটা কথা আমাদের মনে জাগে,—এই যে আমাদের সোণার ভারত চির কাল ধরিয়া—"সমগ্র জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর",—কিরূপে ভিতরে ভিতরে এরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িল? তাহার বাহুবলের কথা শুধু বলি না—তাহার মানসিক বলের অতীত ইতিহাসের কথা, যাহা চিরকাল ধরিয়া বিশ্ববাসীকে চমকিত করিয়া রাখিবে,—তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যাহা আজ আমাদিগের নিকট স্বপ্ন সম প্রতীয়মান হয়—মোট কথা, এরূপ একটা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন বিশাল জাতি, কোন্ শক্তিবলে, কাহার অভিসম্পাতে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহা একটা ভাবিবার কথা বটে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেও বোধ হয় পরিলক্ষিত হইবে না যে ঘরে ঘরে এত বড় হিংসা ও দলাদলির ব্যাপার আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা!—অনেক সময় দেখিতে পাই, হিন্দু সমাজের মধ্যে যে কোন জাতি যখনই ভক্তি ও জ্ঞান বলে বড় হইয়াছে কিম্বা হইবার উদ্যম করিতেছে, তখন অপর কোন জাতি তাহাকে নিতান্ত ঘৃণিত ভাবে অযথা আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এই অল্প দিনের কথা বলি,—যে দিন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বেদান্ত শাস্ত্রের অপূর্ব্ব মহিমা জগদ্বাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাদের হৃদয় এক নবীন আলোকে আলোকিত করিয়া দিলেন; হিন্দুগণের অতীত 'জ্ঞান, পুণ্য ও ধর্ম্ম কাহিনী' শ্রবণ করিয়া বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিদেশী ও বিধর্ম্মী শত শত নর নারী তাঁহার চরণ তলে আশ্রয় লইয়া বেদান্ত ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ লাভ করিয়া শীতল হইল। কি অপূর্ব্ব, কি মহিমান্বিত সে সব ঘটনা।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারের কথা সকলেই অবগত,

আছেন ; তিনি এক জন নগণ্য হিন্দু-সন্ন্যাসী ভাবে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চিকাগো সহরে রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেবের সভাপতিত্বে একটী বিপুল ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছিল ; বোধ হয়, সভার উদ্দেশ্য ছিল,—সমস্ত ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করা ; আর, হিন্দুগণ অসভ্য, মূর্খ ও পৌত্তলিক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই, বোধ হয় তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও করা হয় না। কেবলমাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের খ্যাতনামা প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত কাহারও পরিচয় ছিল না ; কিরূপে সেই মহাসভায় প্রবেশ লাভের অনুমতি পাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা জগদ্বাসীকে শ্রবণ করাইবেন, তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই অখ্যাতনামা হিন্দু-সন্ন্যাসী আজ মহাসভায় দাঁড়াইয়া হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কে তাহাকে অনুমতি দান করিবে? তিনি স্বদেশবাসী মজুমদার মহাশয়কে এজন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়,—আমরা শ্রবণ করিয়াছি,—সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্বামী বিবেকানন্দ যাহাতে সেই ধর্ম্মসভায় প্রবেশ লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হন, মজুমদার মহাশয় তজ্জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"যার যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"—এই প্রচলিত মহাজন বাক্যানুসারে যেন শ্রীভগবানই তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি সেই বিরাট ধর্ম্মসভায় প্রবিষ্ট হইয়া যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—বিদেশীগণ হিন্দুদিগকে ঘৃণা করেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা,—হিন্দুগণ পুতুল পূজা করেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পুতুল পূজা করেন না।—

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if ones tands by and listens, he

will find the worshippers applying all the attributes of God to these Images."

—Lecture on Hinduism.

"Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."

—Lecture on Hinduism (Chicago)

চিকাগো সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর হইতে স্বামীজীর যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সভার প্রধান সভাপতি—রেভারেণ্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব লিখিতে বাধ্য হন—

"India, the mother of Religions, was represented by Swami Vivekananda, the orange monk, who exercised a wonderful influence over his auditors."

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের "বোস্টন ইভ্‌নিং ট্রান্সক্রীপ্ট" নামক সংবাদ পত্র লিখিলেন,—

'He is really a great man,—noble, simple, sincere and learned beyond comparison with most of our scholars." * * * A Professor at Harward wrote to the people in charge of Religious Congress to get him invited to Chicago, saying—"He is more learned than all of us together."

এইরূপ অজস্র সুখ্যাতি তথাকার বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সেসমস্ত উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। বিশেষতঃ

তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অবগত নহেন, এরূপ ব্যক্তি শিক্ষিত সমাজে অতি অল্পই আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মিলন সাধিত হইয়াছে। ভারতের এ হেন রত্নকেও কোন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন!—গত ১৩২৪ সালের ৭ম সংখ্যা 'শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী' নামক মাসিক পত্রিকায় কোন ব্রাহ্মণ লেখক স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন—

"যে বিলাত-প্রত্যাগত বিকৃত-মতি ব্যক্তি বলেন,—স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-গণ আপনাদের প্রাধান্য রক্ষায়, অপর সকলকে হীন করিতে, শাস্ত্রে ইচ্ছা মত বিধি বিধান কল্পনা করিয়াছেন,—ব্যাস শূদ্রদের বঞ্চনা করিবার জন্য ইচ্ছামত বেদের অর্থ করিয়াছেন,—সেই অতি অভাগ্য বিমূঢ়াত্মা যুবক কিনা আর্য্য-সুতের উপদেশক! আমাদের ধর্ম্মবিৎ সাধু মহাজনগণ যথায় অভক্তের মুখ-নিঃসৃত সাধু প্রসঙ্গকেও সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তথায় আজ উপদেশক কে, না—শাস্ত্রের বিপরীত-ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি! ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সন্তান, তাঁহাদের ছলনাপূর্ণ বিচিত্র বাক্যাবলীতে ধর্ম্মের বিচিত্র ছায়ামাত্র দেখিয়াই আজ মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় তাহাতেই মোহিত—ধাবিত। অহো! কি দুর্দ্দৈব। ধন্য কাল! ধন্য বিষ্ণুমায়া!!"

এই রচনার মধ্য হইতে লেখকের কায়স্থ বিদ্বেষ যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে! স্বামীজীর অপরাধের বোঝা বিশেষ ভাবে ভারি হইয়াছে, যেহেতু তিনি আর্য্য-কায়স্থ-সন্তান হইয়া জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন! স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁহার জীবনের উদারতা, অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন-স্রোত,—বহু দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ প্রবাহিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মানব মণ্ডলীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং তাঁহার জীবনের কার্য্য অতি বিশাল ছিল। সাধারণ লোকের দূর হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

আজ আমরা, ভারতবর্ষের বাহিরের সমগ্র মানব সমাজের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া, ঘরে ঘরে এক হইয়া, নিজের পায়ে নিজে দাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইতেছি। যাহাতে দেশীয় শিল্প-কলা আবার দেশীয় হস্তে মূর্ত্ত হইয়া আমাদের ঘরে ঘরে কল্যাণ-শ্রী আনিয়া দেয়, তজ্জন্য সকলেই ব্যগ্র। এ সময় হিংসা দ্বেষ, ঘরে ঘরে দলাদলি, সমস্তই ভুলিতে হইবে,—তাহাতে দেশের ও দশের কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

---

# আকস্মিক বিপদে।*

( শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় )।

অ—বাবুকে অনেক কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং কিছু দিন তাহাকে সুস্থির থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। এখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তাহার বিপদেরও অবসান হইয়াছে। এখন তিনি নিজে কাজ-কর্ম্মাদিও বেশ দেখিয়া লইতে পারেন।

অগ্রহায়ন মাস; ধান্যাদি কাটা হইয়া বাড়ী আসিয়াছে; চাকরগুলি ধান মাড়াই করিবার জন্য এক সঙ্গে কয়েকটী 'মলন' দিয়াছে। অ—বাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া সেগুলি পরিদর্শন করিতেছেন, সময়ে সময়ে বা ( যদিও তাহার অভ্যাস নাই, তথাপি ) দুই এক গাছি করিয়া খড় নাড়িতেছেন। ধন্দের সময়, তাই কাজ কর্ম্মের খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়াছে।

বেলা প্রায় সাড়ে বারটা হইয়া গিয়াছে। অ—বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া শরীরে কিঞ্চিৎ তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেছেন; এমন সময় ঘরের বারান্দা হইতে উঠানে নামিবার সময়ে সহসা পড়িয়া গিয়া অ-বাবু বুকে আঘাত পাইলেন। †—সকলে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল এবং শুশ্রূষা করিয়া স্বস্থ

---

* গত বৈশাখ সংখ্যায় সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল দেববর্ম্মা লিখিত—"আকস্মিক বিপদে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণ। লেখক।

† হাত পা বা অপর কোথাও মচকাইলে দুইটী বেগুন পোড়াইয়া

করিতে যত্নবান হইল। ডাক্তার ডাকা হইল; তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অ-বাবু নিদ্রিত হইলেন; সকলে মনে করিল বুঝি তিনি সুস্থ হইয়া থাকিবেন।

সহসা অ-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওঃ বাবা!—বেদনায় মলেম!" —বলিয়া বিছানা ত্যাগ করিয়া গৃহ মধ্যে মেজের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। সকলে—'কি হইল' বলিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত জনসঙ্ঘ হইতে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া গিয়া লেবুর গাছ হইতে কয়েকটী লেবু আনিয়া তাহার রসের সঙ্গে কিছু সাজিমাটী* মিশ্রিত করিল এবং অ—বাবুকে খাইতে দিল। অ—বাবু বহুক্ষণ হইতে মাটির উপর গড়াগড়ি যাইতেছিলেন; চারি পাঁচ জন লোকে ধরিয়াও ঠিক রাখিতে পারিতেছিল না,—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অম্ল-শূল অনেক কমিয়া গেল এবং তিনি নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরে শুনা গেল, অ—বাবুর পূর্ব্ব হইতেই অম্ল-শূল ছিল; সারা দিন কিছু না খাওয়ায় এবং শারীরিক পরিশ্রমে সেই পূর্ব্বের ব্যারাম বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

* * * * * * * * *

অ—বাবু ভাল হইয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে প্রাতঃকালে এবং বৈকালে বেড়াইতে বলিয়াছেন। অ—বাবু তাঁহার জনৈক বন্ধুর সহিত প্রভাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়াই প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিছু দূর গিয়া সহসা তিনি চোখ ডলিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"ওহে, দেখ, আমার চোখটা যেন কেমন করছে। এই বাতাসের সঙ্গে বুঝি চোখে কিছু ঢুকেছে!"

---

তাহার খোসা সন্তর্পণের সহিত উঠাইয়া, বোঁটাটিও আবশ্যক মত ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহার পরে ঐ বেগুণ দুইটী খুব গরম থাকিতেই মচ্‌কান স্থানের দুই পার্শ্ব দিয়া নেকড়া দিয়া বান্ধিয়া দিবে; কলার পাতা দিয়া জড়াইয়া পরে নেক্‌ড়া দিয়া জড়ানই ভাল। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মচ্‌কান স্থান দুই তিন দিনেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

* এক তোলা উত্তম সাজিমাটীর সহিত দুই তোলা পরিমাণ কাগজি লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন সেবনে কঠিন অম্লশূলও ভাল হইতে পারে।

তাঁহাকে প্রথমেই বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"আর ডলিও না।"—তার পর চোখ ভাল করিয়া দেখা গেল—কিছুই নাই। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইতে লাগিল—চোখের বেদনাও বেশী হইল। দেখা গেল—চোখটী খুব রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই জন গ্রাম হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে গিয়াছেন,—আসিয়া যে চিকিৎসককে দেখাইবেন, তাহাও আর অ-বাবুর সহ্য হইতেছে না; বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখটি লালও বেশী হইল। সঙ্গে রুমাল ছিল, অ-বাবুর বন্ধু তাহাদ্বারা তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিলেন এবং রাস্তার ধারে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন।

সহসা অ-বাবুর বন্ধু দৌড়াইয়া আসিলেন এবং কতকগুলি পাতা বাম হাতের তালুতে লইয়া রগড়াইতে লাগিলেন; তাহা হইতে যে রসটুকু পাওয়া গেল, তাহাই চোখে দিয়া পুনরায় চোখ বাঁধিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরিলেন। পথেও অ-বাবুর বন্ধু পাতার রস ৩।৪ বার চোখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেদনা এখন কেমন হয়েছে?"—অ-বাবু বলিলেন—"অনেক কম।"

দিনের মধ্যে আরও কয়েক বার ঐ পাতার রস প্রয়োগ করা হইল ও একখানি রুমাল হলুদদ্বারা রং করিয়া চোখটি পূর্ব্ববৎ বাঁধা রহিল বলা বাহুল্য এই পাতা অন্য কিছুই নহে—চাতিগুঁড়ের পাতা। অ-বাবুর বন্ধু নিজের চোখ উঠিলে এই টোট্‌কা ঔষধটি তাঁহার দিদিমার নিকট শিখিয়াছিলেন।

* * * * * * * * *

অ-বাবু এখন সুস্থ হইয়াছেন। আবার বন্ধুর সহিত সকালে ও বৈকালে নিয়মিত বেড়াইতে যান। আজ বৈকালেও বেড়াইয়া আসিয়া পায়ের নখে কিছু বেদনা অনুভব করিলেন; কিন্তু তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেন না;—কারণ এরূপ বেদনা আজ কয়েক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। রাত্রিতে আহারান্তে ঘুমাইবেন, কিন্তু অ-বাবুর তাহা ঘটিয়া উঠিল না,—পায়ের নখে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বিছানায় আর থাকিতে পারিলেন না—ঘুম হইল না,—গিয়া বন্ধুকে জাগাইলেন।

অ-বাবুর বিশ্বাস ছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত রোগেরই টোট্‌কা জানেন; বাস্তবিক বন্ধু তাঁহার দিদিমার নিকট বহু রোগের টোটকা ঔষধ শিখিয়াছিলেন।—অ-বাবু তাঁহার বন্ধুকে সবিশেষ বলিলেন। বন্ধু পায়ের নখটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—বিশেষ কিছুই নহে,—নখের ভিতর কিছু ময়লা গিয়াছে এবং কুণিটা মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অ-বাবুর বন্ধুর নিকট 'খুটিনাটি' অনেক জিনিষ থাকিত। একখানি নরুণ দ্বারা নখটি কাটিয়া তৎসাহায্যে নখ-কুণি পরিস্কার করায় কাদা বাহির হইল; পরে তিনি প্রদীপটা নিকটে আনিয়া এক পলা* সরিষার তৈল প্রদীপের শিষে ধরিলেন। ঐ তৈলটুকু গরম হইয়া ক্রমে যখন ফুটিতে লাগিল, তখন অ-বাবুর বন্ধু তাহাতে যেন কিসের গুঁড়া ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি এই তৈল লইয়া উহা গরম গরম অ-বাবুর নখ-কুণিতে দিতে লাগিলেন। এই তৈল প্রয়োগ করার পর বেদনা কম হইল এবং অ-বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সেই তপ্তের মত গুঁড়া জিনিষটা—ভুঁতে ভস্ম।

• • • • • • • • •

অ-বাবু এবার সত্ত আরোগ্য লাভ করিয়া বন্ধুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। কিছুদিন বেশ ভালই থাকিলেন,—সম্ভবতঃ তাঁহার দুঃখের শেষ হইয়াছে। আজ তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। বন্ধুর নবজাত পুত্রের অন্নারম্ভ;—সকলেই সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারান্তে অ-বাবু কয়েক জন বন্ধুর সহিত তাস খেলিতে বসিলেন। খেলা বেশ জমিয়াছে—অ—বাবু 'ব্রীজ' খেলা জানিতেন না, তাহাই শিখিতেছেন। বন্ধুগণের নিকট অদ্যই তিনি "ডবল্—রীডবল্" ( Double-Redouble ) নূতনখেলা শিখিয়াছেন। অ-বাবুর আমোদ ও ফূর্ত্তীর সীমা নাই;—ঘন ঘন তামাক চলিতেছে—খেলা বেশ লাগিয়াছে।

---

* তৈলাদি গ্রহণার্থ দর্ব্বীবিশেষ। কোথাও কোথাও ইহাকে "তোলা" বা ( অতি ক্ষুদ্র ) "হাতা" বলিয়া থাকে। লেখক

এ দিকে কল্কি হইতে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ফরাসে পড়িয়াছে, তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই ;—চাদরে ধরিয়া আগুন ক্রমে অ-বাবুর কাপড়ে ধরিয়া পড়িল। সহসা অ-বাবু—"আগুন—আগুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং গা হইতে কোট, গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমেই আগুন প্রবল হইয়া উঠিল,—অ-বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বেও একবার অ—বাবু তামাক খাইতে খাইতে কাপড়ে আগুন ধরাইয়া পুড়িয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু আবার আগুন ধরিয়াছে, তবুও উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বুদ্ধি হইয়াছেন।

আকস্মিক বিপদে এইরূপ হতবুদ্ধি হইলে চলিবে না, স্থির ভাবে—যাহা করিলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাই করিতে হইবে। শরীরে কোট, গেঞ্জি প্রভৃতি থাকিতে আগুন ধরিলে, তাহা খুলিতে চেষ্টা করিবে না। ঐরূপ অবস্থাতে আরও কিছু মোটা কাপড় অথবা কম্বলাদি দ্বারা নিজ শরীর জড়াইয়া মেঝেতে গড়াইতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে অতি শীঘ্র আগুন নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।—অ-বাবুর বন্ধু দৌড়িয়া আসিয়া তাহাই করিলেন ; এ যাত্রাও অ-বাবু রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু অনেক স্থানে রীতিমত পুড়িয়া গেল। ঘরে খাঁৎগুড় ছিল ; বন্ধু তাড়াতাড়ি অ-বাবুর কোট, গেঞ্জি খুলিয়া শরীরে ঐ গুড়ের প্রলেপ দিয়া দিলেন। ইহাতে কতকটা জ্বালা ও ফোস্কা নিবারিত হইল বটে,—কিন্তু অ—বাবু জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া কিছু মধু আনিয়া তাবৎ শরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন,—ঘরে যব-চূর্ণ ছিল, মধুর উপর যব-চূর্ণের প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইল এবং ফোস্কাও উঠিল না।—কিন্তু একটি স্থানে কেমন করিয়া যেন ফোস্কা উঠিয়া গলিয়া গেল এবং একটু ঘা'এর মত হইয়া পড়িল। অ—বাবুর অস্থিরতার জন্য, তাঁহার বন্ধুও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের টোটকার* উপর বিশ্বাস

---

* দগ্ধ হইয়া ক্ষত হইলে "কেচো-তৈল" বিশেষ উপকারী। কেচোর সহিত তিলের তৈল জাল দিয়া এই তৈল প্রস্তুত করিতে হয় ;—ইহাতে দগ্ধ জনিত ক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। লেখক।

না করিয়া, চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইবেন—স্থির করিলেন। * বারান্তরে তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব—বাসনা রহিল।

---

## সে যে।

( শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা )।

সে যে চলে গেছে দূরে ত্রিদিবের পথে
মায়ার বন্ধন ছিঁড়ি;
সে যে আসিবে না হেথা আসিবে না আর,
চাহিবে না কভু ফিরি।
ছিল এ মর জগতে জ্যোৎস্নার হাসি
মন্দার পারিজাত;
যেন এ ঘোর আঁধারে আলেয়ার আলো
আশীর্ব্বাদ দেবতার।
মম নিরাশ হৃদয়ে ছিল আশালতা
মরমের আশা-তরু;
ছিল বিশুষ্ক কণ্ঠের সুশীতল বিন্দু,
প্রেমের দেবতা গুরু।
সে যে বাসন্তী-সুষমা বিহগ-কূজন
বীণার ললিত তান,
ছিল পরাণের কথা শান্তির লহরী
চাহে নাই প্রতিদান।
যেন অভিনব কোন স্বরগের লোক
গরীয়ান্ মহামতি;
পেয়ে অভিশাপ-তাপ ছিল এ ধরায়
হায়! অযতনে অতি।
সে যে কত সাধনার কামনার নিধি
কত গরবের ধন;

ছিল কতই মধুর কত স্নেহময়
কত আপনার জন।
সে যে ভেঙ্গে দিয়া গেছে সুখের স্বপন
আশার মোহন সুর;
সে যে দলিত করিয়া মরম মাঝার
চলে গেছে বহুদূর।

---

## কলেরার প্রতিষেধক।

( শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ, মালুচি, ঢাকা )।

কাগজী লেবুর রস—সিকি তোলা ও এক আনা—লবণ, কলেরা আক্রান্ত দেশে প্রত্যহ খালি পেটে সেবন করিলে কলেরা হইতে পারে না। ইহা পাচক ও হজমী। ইহা আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ( Experiment) করিয়া দেখিয়াছি। কাগজী লেবুর অভাবে এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের ডাইলুটেড্ সালফিউরিক এসিড ২।১ ফোটা এক আউন্স জলে মিশাইয়া প্রত্যহ খালি পেটে সেব্য। ইহাতে বেশ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে কিন্তু একটু কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। এই ঔষধ আমরা ২০ বৎসর ব্যাপী কলেরা আক্রান্ত দেশে প্রায় ১৫হাজার লোককে বিনামূল্যে ব্যবহার করাইয়া ফলাফল নির্ণয় করিয়াছি। যাঁহারা এই ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের কলেরা আক্রান্ত হইতে আমরা দেখি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ডাক্তার মহাশগণ এই প্রতিষেধক ঔষধটি বড় একটা ব্যবহার করিতে চান না; কেন চান না, তাহা অজ্ঞাত। অম্লরস কলেরার বিষ নষ্ট করে, ইহা আমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ জানিয়াছি। কাগজী লেবুর রস নির্দ্দোষ অম্লরস,—দীর্ঘ দিন ব্যবহারে কোন ভয়ের কারণ নাই, বরং ডিস্পেপ্সিয়া ( Dyspepsia ), অক্ষুধা ও পেটফাঁপা থাকিলে তাহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। *

---

* বিস্তারিত মল্লিখিত "স্বাস্থ্য-বার্তা" পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। দুই পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইলে ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। লেখক।

# বামা রচনা।

## পথের সাথী।

( শ্রীমতী সুষমা দেবী, ফরিদপুর )।

অনন্ত পথের মা আমি সন্তান ;
কেহ মোর সাথী নাই ;
সকলি আঁধার, মোহে অন্ধ আঁখি
কি ন্তু না দেখিতে পাই।
কাহারে সুধাই কে দিবে বলিয়া,
আমি কোন্ পথে যাব ?
কোন্ পথে গেলে, হে অনাথ নাথ !
পথের সন্ধান পাব ?
ধর্ম্মের আলোক নাহি মোর সাথে
নাহি গো পুণ্যের বল,
আঁধারে হাতাড়ি' পড়ি বারে বারে—
হাতে ধরি নিয়ে চল।
পতিতের সখা, অনাথের সাথী,
কেবল তুমিই হরি,
নিয়ে তব নাম চলিয়াছি পথ,
মনে বড় আশা করি'—
নিরুপায় বলি' এ দুর্গম পথে
লহ সাথে দয়া করে,

আলোটি ধরিয়ে, পথ দেখাইয়ে,—
নহিলে রহিব পড়ে।
চিরদিন আমি ভুলিয়ে তোমায়,
করেছি সংসার-খেলা,
সাথী তো কেহ হ'ল না আমার,
এখন যাবার বেলা।

---

# আশা-পথে।

(শ্রীমতী চারুশীলা দেবী)।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত হোটেলের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দুই জন বঙ্গীয় যুবক মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেছিলেন; ভোজন শেষ হইলে উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রায় সম-বয়স্ক; কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এক জনের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, মুখশ্রী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বেশ মানান-সই; আয়ত চক্ষু-যুগল হইতে যেন একটী প্রতিভার দীপ্তি পরিলক্ষিত হইতেছিল; মুখখানি তেজস্বিতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রকাশক। দ্বিতীয় যুবক—গৌরবর্ণ, আকৃতি একহারা, ছিপ্‌ছিপে, কিছু দীর্ঘাকৃতি মুখশ্রী সুন্দর, মস্তকের কেশগুলি ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ,—সহসা দেখিলে তাহাকে 'ইয়োরেশিয়ান' বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু আকার-প্রকার ও কথাবার্ত্তায় তাহার মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভাব বলিয়া অনুমান হয়। পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

প্রথম ব্যক্তি কিছু উত্তেজিত ভাবে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল—'আমি তোমার ও সব কৈফিয়ৎ মোটেই শুনতে

চাই না, অরুণ !—তুমি আমার সঙ্গে দেশে যাবে কি না, তাই স্পষ্ট ক'রে বল ?"

অরুণ যে কি উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না,—একটী কথাও তাহার মুখে আসিল না,—তখন মাথাটী হাতের উপরে রাখিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রথম যুবক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল ও অরুণের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"কিহে ? চুপ করে বসে রইলে যে। উত্তর দিচ্ছ না, কেন ?"

অরুণ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ ?—কি বলছ, অজয় ?"

অজয় বলিল—"বলছি—ভাল !—এতক্ষণ বকে মলেম, কথাগুলো কি কাণে গেল না ? বলছি যে, এই জাহাজেই আমি বাড়ী যাচ্ছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

অরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল—"রাগ করছ কেন অজয় ! বলেছি তো, আমি দিন কতক পরেই যাব।"

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে অজয় বলিল—"দিন কতক পরে গেলে চলবে না, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। আমি আসবার সময় বাড়ীর সকলকে বলে এসেছি—তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ; তাই, আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবই।"

অরুণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন আমার কেমন করে যাওয়া হতে পারে ?"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ ?"

নতমুখে অরুণ উত্তর করিল—"শীগ্‌গির আমায় নতুন বাঘ দু'টোকে নিয়ে খেলা করতে হবে, পার্টির সুনাম আমার উপরেই নির্ভর করছে।—এ সময় যদি আমি চলে যাই, তা হলে সব মাটি হয়ে যাবে। নতুন বছরে নতুন বাঘের খেলা হবে ; এতে আমার লাভও আছে। বিশেষতঃ, এ সময়ে আমি যদি চলে যাই, তা হলে তারাই বা আমাকে বলবে কি ? আমি তোমাকে বলছি, দিন কতক পরে নিশ্চয় আমি যাব।"

অজয় বলিল—"এই সুদীর্ঘ দশ বছরেও তোমার খেলা শেষ হ'ল না অরুণ !

তুমি আবার দিন কতক পরে যাবে। এ কথা বলতে, তোমার একটু লজ্জাও হ'ল না! স্ত্রী,পুত্র,পিতা, আত্মীয়-স্বজন, জন্মভূমি—এ সব হ'তে এরাই তোমার হল বড়? একবারও কি তাদের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে না, অরুণ? তোমার অভাবে তোমাদের সোণার সংসার শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। তোমার বাবা দিন রাত 'হা—অরুণ, হা অরুণ'—করছেন, আর তুমি এখানে একটা বিদেশী স্ত্রীলোককে নিয়ে, তার সঙ্গে সং সেজে, বিদেশীকে রঙ্গ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ? অতুল ঐশ্বর্য্য, অগাধ মানসম্ম ও বংশ-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে এখানে তুমি বন্য জন্তু নিয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছ? যেমন সহবাস, তোমার প্রকৃতিও ঠিক তার উপযুক্ত হয়েছে!"

অরুণ নীরবে অজয়ের কথাগুলি শুনিল,—কিন্তু কোনই উত্তর দিল না। অজয় আবার বলিতে লাগিল—"আচ্ছা, তোমার নিজের কথা ভেবেও কি তোমার মনে লজ্জা হয় না, অরুণ? এখানে এসেছিলে মানুষ হ'তে,—হয়ে উঠছে তো—একটা জানোয়ার! তোমার কাণ্ড দেখে সমস্ত ইংলণ্ড প্রবাসী যুবকেরা ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছে, তোমার চরিত্র আলোচনা ক'রে তোমায় শত ধিক্কার দিচ্ছে.—কিন্তু তোমার নিজের কি তাতে একটুও লজ্জা নেই? তুমি হিন্দুর ছেলে, ঘরে তোমার স্ত্রী-পুত্র সব বর্ত্তমান,—আর তুমি কি না এখানে একটা অভিনেত্রীর প্রেমে মুগ্ধ আছ! কি আর বলবো তোমাকে? তুমি তিরস্কারেরও অযোগ্য।"

এবার অরুণ মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি বৃথা আমাকে এত তিরস্কার কচ্ছ। আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি? ইংলণ্ডে এসে কোন দিন কি কোন বাঙ্গালী, মেম বিয়ে করে নি?"

দৃঢ় স্বরে অজয় উত্তর করিল—"হ্যাঁ,ক'রেছেন, সে কথা অস্বীকার কচ্ছি না, কিন্তু তাঁরা তোমার মত কুলাঙ্গার ছিলেন না, অথবা নন। তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে একটী অভিনব পদার্থ। তাই তোমার কীর্ত্তিটা কিছু বেশী রকমের।"

অন্যমনস্ক ভাবে অরুণ বলিল—"কিসে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে অজয় বলিল—"কিসে! তাও আবার দেখিয়ে দিতে হবে?—প্রথমতঃ,—তোমার মতন ক'জন বাঙ্গালী মনুষ্যত্ব শিখতে এসে, এমন

পশুত্ব শিক্ষা করে গেছেন, বল ? দ্বিতীয়,—বুড়ো বাপ, স্ত্রী-ছেলে, বাড়ী-ঘর সব ত্যাগ করে তোমার মত কে ইংলণ্ডে সার্কাস দেখিয়ে কাল কাটাচ্ছে, বল দেখি ? তৃতীয়—যাঁরা ইংলণ্ডে এসে মেম বিয়ে করেছেন, তাঁরা কুমার,—বিয়ে করেও তারা স্বদেশে ফিরে গেছেন, মনুষ্যত্ব ভুলে যান নাই। তোমার মত দেশ ছেড়ে,—স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একটা অভিনেত্রীকে নিয়ে এমন করে কে চির দিন এখানে কেলেঙ্কারীটা কচ্ছে, বল দেখি ! তবু তুমি বল্‌তে চাও—এমন কোনও গুরুতর অপরাধ তুমি কর নি ! তবু তুমি জানাতে চাও—তুমি নিষ্ঠুর-পাষণ্ড নও ? তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে অথচ ধীর ভাবে অরুণ বলিল—"কেলেঙ্কারী কিছু করিনি অজয় ! 'হেনা' আমার স্ত্রী ; আমি হেনাকে আইন সম্মত মতে বিবাহ করেছি।"

সহসা যদি অজয়ের পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় অজয় এতটা আশ্চর্য্য হইত না ;—বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"বিবাহ !"

অরুণ নীরব।—"জান, তুমি বিবাহিত ! জান, তোমার স্ত্রী আছে"—বলিয়া অজয় কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে থাকিয়া বলিল—"আমাদের দেশের নিরীহ মেয়েদের উপর যা খুসি অত্যাচার করতে পার, তাদের সহস্র প্রকারে নির্য্যাতন করতে পার, একটা স্ত্রী থাকতে আরও পাঁচটা বিয়ে অক্লেশে করতে পার,—তাতে একটা কথা কইবার অধিকারও স্ত্রীর নেই ; কিন্তু এই স্বাধীন দেশের সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী মেয়েদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহারটী করবার যে যো নেই,—সেটা জান ? তোমার স্ত্রী বর্ত্তমানে, ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করে খ্রীষ্টান সমাজে কি গুরুতর অপরাধ করেছ, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি ? কথাটা কোন রকমে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে,—তা হলে এখানকার আইনে তোমার কি শাস্তি, তা জান ?"

নত মুখে অরুণ উত্তর করিল—"জানি, জেল !

অজয় বলিল—"তবে ? জেনে-শুনে এমন প্রেমে পড়া বীরোচিত কার্য্য বটে ! কিন্তু এমন প্রেম, নভেলেই দেখতে পাওয়া যায়—বাস্তব জগতে এ রকম বড় একটা পাওয়া যায় না। এটা বড়ই ভয়ঙ্কর ; কোনও প্রকারে

তোমার প্রণয়িনী যদি জানতে পারেন—দেশে তোমার স্ত্রী আছে, তা হলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে! জান, অরুণ! এ হিন্দু নারী নয় যে, পদাঘাত খেয়ে পদানত হয়ে থাকবে, উপেক্ষার পরিবর্ত্তে পূজা করবে!"

অরুণ বলিল—"তুমি তাকে ভুল বুঝেছ, অজয়! সে রকম মানুষ সে নয়, তার হৃদয় দয়ামায়ায় পূর্ণ; সে আমাকে যেমন ভালবাসে—এমন বোধ হয় তোমার হিন্দু নারীরাও বাসতে পারে না। তাকে তুমি ভুল বুঝেছ।"

একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অজয় বলিল—"ভুল আমি বুঝিনি—অরুণ, ভুল তুমি বুঝেছ। কিন্তু এটা ঠিক জেন, বাঙ্গলার জল-বায়ুতে তোমার দেহ গড়া, এ স্বাধীন মহিলাদের স্বাধীনতার উত্তাপ চির দিন কখনই সহ্য করতে পারবে না; তখন বুঝতে পারবে, হিন্দু-নারীতে আর স্বাধীন-নারীতে কত প্রভেদ, আরও বুঝবে, কি তারতম্য তাদের এই ভালবাসাতেও! আজ যদি কোন কারণে তোমার একটু ত্রুটি হয়, তা হলে দেখবে তোমার 'তিনি'—কাল তোমাদের বিবাহের সার্টিফিকেট খানা ছেঁড়া কাগজের ধামায় ফেলে দেবে!—হতভাগ্য তুমি! হিন্দু হয়েও হিন্দু নারীর মর্য্যাদা বুঝতে পারলে না! তোমার এ সমস্ত কাহিনী শুনলে, আর কি তোমার বুড়ো বাপ বাঁচবেন? একে তোমার ইংলণ্ড-বাসের পরই তোমার যে সব কাহিনী শুনেছেন, তাতেই তিনি জীবন্মৃত হয়ে আছেন; তবে আমি আসবার সময় বুঝিয়ে বলে এসেছি—তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবই, সেই আশায় তিনি পথ চেয়ে আছেন। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তা হলে তার অবস্থা যে কি শোচনীয় হবে—একবার মনে করে দেখ দেখি! আর সেই সরলা শিশির! সেই পতি-প্রাণা সাধ্বীর কথাটাও একবার ভেব।"

অরুণ নীরব। কিছুক্ষণ পরে অজয় আবার বলিল—"তুমি যখন ইংলণ্ডে এস, তখন তোমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিল—সে কথা মনে পড়ে?"

নত মুখে ধীরে ধীরে অরুণ বলিল—"পড়ে।"

"তার একটী ছেলে হয়েছে, সে খবরটাও বোধ হয় তোমার বাপের চিঠিতে পেয়েছিলে।"

"পেয়েছিলেম।"

"ছেলেটী জন্মাবধি পিতৃদর্শনে বঞ্চিত। আহা!—সেই পাঁচ বছরের বাল-

কের প্রাণেও গভীর বিষাদের ছায়া দেখে এসেছি।. আমি আসবার সময় তাকে কাছে ডেকে বল্লেম—'সুবোধ, আমি তোমার বাবাকে আনতে যাচ্ছি।' তাতে সে মুখ খানি ম্লান করে আধ আধ ভাষায় বল্লে—'বাবা যদি না আসে?' আমি তাকে উৎসাহ দেবার জন্য জোর করে বল্লেম—"হ্যাঁ, আসবে না বই কি! না আসে, আমি তাকে জোর করে আনব।" কিন্তু কচি শিশু বল্লে—"বাবার খুব জোর,—বাঘ নিয়ে খেলা করে!"—এখন দেখছি, সেই শিশুর কথাই সত্যে পরিণত হল।"—অজয় পকেট হইতে তিন খানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখাও তো এক দম বন্ধ করেছ, কিন্তু চিঠি তিন খানা একবার একটু দয়া করে পড়ে দেখ' দেখি'!"

অরুণ নির্ব্বাক। অজয়ের শ্লেষ বাক্যে সে কোনও উত্তর দিল না, চিঠি-গুলিও পড়িল না। তাহার ভাব দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে অজয় বলিল—"বাড়ীর চিঠিগুলো একবার পড়ে দেখতেও কি দোষ! তাতেও কি তোমার 'হেনার' প্রেম হ্রাস হয়ে পড়বে নাকি? আচ্ছা আমিই পড়ছি—একবার শোন!"—অজয় একখানি চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল; পত্রখানি অরুণের পিতা রমাপ্রসাদ চৌধুরী অজয়কে লিখিতেছেন—

"প্রাণাধিক অজয়!

তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং সত্বর বাড়ী আসিতেছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর। শ্রীভগবান সর্ব্বদা তোমার অজস্র কল্যাণ বিধান করুন। অরুণ তোমার সঙ্গে আসিবে তো? আহা! কত দিন তার মুখ খানি দেখি নাই! এক খানা চিঠিও আর সে আমাকে লেখে না। কত পুঞ্জীকৃত আশা নিয়ে তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেম; তখন কে জানিত, যে আমার ভাগ্য-বিধাতা আমার উপর এমন রুষ্ট হইবেন! তাহাকে দিয়ে অনেক আশা ভরসা করিয়া ছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করিও—কেমন করিয়া সে এত দিন আমাদের ছাড়িয়া আছে। তাকে না দেখে আমার বুকে শেল বিদ্ধ হই-তেছে। ওঃ—জানি না কার অভিশাপে আমাকে এমন মনস্তাপ পাইতে হই-তেছে! তোমার আসবার কথা শুনে পর্য্যন্ত সুবোধের তো আহার নিদ্রা নাই। মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—'বাবা, বাবা'—বলে চীৎকার করিয়া উঠে।

অরুণকে তুমি কোন মতেই ছাড়িয়া আসিবে না ; তাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়, জীবনের দিন আমার ক্রমশঃই ফুরিয়ে আসিতেছে,—এখন তার উপর সংসারের ভার দিয়ে মরিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তার সঙ্গে তোমার রোজ দেখা হয় তো ? তুমি কেমন আছ লিখিও। আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

শুভার্থী—

শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরী।"

দ্বিতীয় পত্রখানি অরুণের স্ত্রী শিশিরকুমারীর ; সেও অজয়কে লিখিতেছে—

"ভাই ! . . .

তোমার পাশ এবং আসবার খবর পেয়ে কতখানি যে আনন্দ হল, তা লিখে প্রকাশ করা আমার সাধ্য নেই। তবে যতক্ষণ না এসে পৌঁছুচ্ছ, ততক্ষণ আর নিশ্চিন্ত হতে পারছি না জানি না, সে দেশের মাটিতে কি আছে। সেটা কি কোন কুহকের দেশ, না ইন্দ্রজাল ? সে দেশে গেলে মানুষের মতিগতি এমন হয়ে যায় কেন বলতে পার ? কেমন করে যে তারা আপন জনের মায়া-মমতা ভুলে যায়, তা কিছুই বুঝতে পারি না। শুনতে পাই, পূর্ব্বে লোকে বিলেত গেলেই খৃষ্টান হত, মেম বিয়ে করত, কিন্তু তবুও যা হোক দেশের মানুষ দেশে ফিরে আসত—তার আত্মীয়-স্বজন তাদের দেখতে পেত। এখন দেশের স্রোত ফিরে গেছে, এখন ত প্রায়ই লোকে বিলেত যাচ্ছে—তারা আর খৃষ্টানও হয় না, মেমও বিয়ে করে না। লেখাপড়া শিখে এসে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে, কিন্তু তার ভিতর থেকে আবার এক এক জন এমন হয়ে ওঠেন, যে তাঁরা সে পরীর দেশে গিয়ে দেশে ফিরে আসতে পর্য্যন্ত নারাজ। কেন এমন হয়, বলতে পার ? পরীরা কি তাদের উড়িয়ে নিয়ে আসমানের হাওয়া খাইয়ে আনে ? কেমন করে তারা মানুষের স্নেহ-মমতা সব ভুলিয়ে দেয় ?

আশা করি তুমি ভাল আছ। আর একটা আশা করতে পারি কি ? তাঁর আশা কি নিতান্তই দুরাশা ? কিছু গোপন করো না—সমস্ত খুলে লিখো। কোন্ জাহাজে বেরুচ্ছ, লিখো। আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার বৌদি।"

শিশিরের চিঠির পেছনেই অরুণের শিশু পুত্র তাহার হাতের বড় বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়াছে—

"পিশে মশাই! আপনি যাবার সময় বলেছিলেন—বাবাকে নিয়ে আসবেনই! দেখবেন, সে কথা ভুল্‌বেন না। অন্থু, মিনু, শিবুর মতন আমিও আমার বাবাকে "বাবা, বাবা" ডাক্‌তে পাব। কি মজা! ওঃ—কবে আপনাদের আস্‌বার দিন হবে! কতক্ষণে আমার বাবাকে আর আপনাকে দেখতে পাব? আপনারা আমার প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত—শ্রীসুবোধকুমার চৌধুরী।"

চিঠি পড়িয়া অজয় অরুণের দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখ,দেখি, এতেও তোমার প্রাণ একটু কেঁদে উঠে না?"

তৃতীয় পত্রখানি অজয়ের স্ত্রী এবং অরুণের ভগ্নী—ইলারাণীর। ইলা লিখিতেছে—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

তোমার চিঠি পেলেম। পাশ হয়েছ শুনে আহ্লাদ হল। কিন্তু তোমার পাশের খবরের চেয়েও তোমার আসবার খবরে আমি বেশী খুসি হয়েছি। বাপ!—কতদিন হল তোমাকে সেই পরীর দেশে পাঠিয়ে আমার প্রাণটা যেন অস্থির হয়েছিল। ভাইকে তো সে দেশে পাঠিয়ে হারাতে বসেছি, আবার পাছে তোমার গায়েও তাঁর বাতাস লাগে, সেই ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না। যাই হোক, এখন তোমরা সেই পরীর দেশ থেকে একবার এলে, আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দাদার কথা কিছু লেখনি কেন? একা আসছ,—না সঙ্গে লিলি, বেলা, ক্লোরা, ফ্লোরা সব আছেন? বরণডালা সাজাব নাকি? দাদাকে কিন্তু সঙ্গে করে আনা চাই, নইলে বৌটা বাঁচবে না। মেয়ে মানুষের স্বামী যে কি জিনিষ—তা মেয়ে মানুষেই জানে, তোমরা তার কি বুঝবে? ঠাকুরপো এসেছে, আমি কাল কলিকাতায় যাচ্ছি, সেখানে গেলে তবু দুদিন আগে তোমাকে দেখতে পাব। ঠাকুর পো বলেছেন, বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে বম্বে যাবেন তোমাকে আনতে—তাই আরও তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। তবে আজ ৮০। বড্ড তাড়াতাড়ি; বাক্স, ট্র্যাঙ্ক গুছুতে হবে। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার—ইলা।"

চিঠিগুলি পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া অজয় বলিল—"এতদিন বিদেশে বাস করেও তোমার আশা মেটে নি, অরুণ!—বাপ্! আমার তো এই কয় বছরেই আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখবার জন্য প্রাণ ছটফট্ করছে! একবার দেশে যেতে পারলেই বাঁচি।"

অরুণ বলিল—"না, না, সত্যিই বলছি—দিন কতক পরে এবার আমি নিশ্চয় যাব। আমার কথা বিশ্বাস কর, অজয়।"

অজয় বলিল—'হুঁ—বিশ্বাস? তোমার কথায় বিশ্বাস করবার দিন চলে গেছে, অজয়। এখন আমি দেশে গিয়ে সকলের কাছে কি জবাব দেব—তোমার বুড়ো বাপকে কি বলব, আর হতভাগা ছেলেটাকেই যে কি বলে বোঝাব, সেইটেই হচ্ছে আমার বেশী ভাবনা। তুমি জান, অরুণ! আমি যখন যা করব বলেছি, এ পর্য্যন্ত তার কোন কথা অন্যথা হয় নি! তোমার জন্য যে আজ আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে হবে—সেও আমার একটা আক্ষেপ।"

বলিতে বলিতে অজয় আবেগে অরুণের হাত দুই খানা ধরিয়া বলিল—"অরুণ! আমাদের আগেকার কথাগুলো একবার মনে করে দেখ্—সেই ছেলে বেলা থেকে কি ভাবেই ছিলুম দুজনের। একে অন্যকে এক দিন না দেখতে পেলে, থাকতে পারতেম না। তার পর বড় হয়ে, পাশ করলেম, তোর সঙ্গে একটা সম্বন্ধও হ'ল,—তখনও সেই ভাব। আমাদের সেই ছোট বেলার কথা মনে করে, আজ আমার অনুরোধটা রক্ষা কর্ ভাই! এক বার তুই আমার সঙ্গে দেশে চল্, তার পর, সেখানে মন না টেঁকে—আবার চলে আসিস্। তোকে একটী বার দেখবার জন্য বাড়ীর সকলে কি রকম ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, তাতো বুঝতে পারিস ভাই।"

কিন্তু অরুণের সেই একই কথা—"নূতন বাঘের খেলা করতে হবে, এখন কিছুতেই যেতে পারবো না, দিন কতক পরে যাব।"

তখন ক্রুদ্ধভাবে অরুণের হাত ছাড়িয়া দিয়া সাক্ষেপে বলিয়া অজয় বলিল, 'ওঃ! এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোমার? যেমন হিংস্র জন্তু নিয়ে সহবাস, স্বভাবও ঠিক সেইরূপ হয়েছে।'

একটু নীরব থাকিয়া,—অতি কষ্টে অশ্রুবেগ দমন করিয়া অজয় পুনরায়

দৃঢ় স্বরে বলিল—"একেবারে গোল্লায় গেছ। বৃথা তোমার জন্য আক্ষেপ। এই জন্য কি তোমার বাবা টাকা খরচ করে তোমায় এখানে পাঠিয়েছিলেন? এবার কিন্তু আমি তাঁকে টাকা পাঠাতে বারণ করে দেব। এমন অকৃতজ্ঞ ছেলেকে ত্যাজ্য-পুত্র করা উচিত। এমন কৃতঘ্ন ছেলের জন্য আবার মায়া-মমতা কিসের? আর সেই হতভাগা ছেলেটা বাপকে দেখবার আশা করে যে বসে আছে, তাকে গিয়ে বল্‌ব—'তোর বাপ নেই—মরেছে!'—এমন পাষণ্ড বাপ গেলেই বা কি, আর থাক্‌লেই বা কি!"

টেবিলের উপর হইতে টুপিটা মাথায় দিতে দিতে অরুণের দিকে আর একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া দৃঢ় পদ বিক্ষেপে অজয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; আর অরুণ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল; তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু কক্ষতলে পতিত হইল। এমন সময় হোটেল-স্বামিনী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহাশয়। আহারের এক ঘণ্টা পরেই ঘরখানি খালি কববার কথা ছিল, কিন্তু প্রায় দুঘণ্টা হয়—" অরুণ ত্রস্তে চোখের জল মুছিয়া ও হোটেল-স্বামিনীকে প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে সেই প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল; হোটেলের ভাড়া, আহারের ব্যয়াদি অজয় অগ্রেই মিটাইয়া দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

# আত্মজ্ঞান।

(শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর)।

(যোগবাশিষ্ঠের সার সঙ্কলন)।

সংসারে আত্মা ব্যতিরেকে আর কোন পদার্থই নাই। এই বসুন্ধরায় যাহা কিছু নয়ন গোচর হয়, তৎসমুদায়েরই কোন না কোন সময়ে ক্ষয় হইবে ও ক্ষয় হইয়া থাকে। এই মুহূর্ত্ত যাহা নিরীক্ষণ করা যায়, পর মুহূর্ত্তে বা কিছু দিন পরে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সংসারের সকলই লয়শীল, কিছুই স্থায়ী নহে; কিন্তু আত্মার ধ্বংস নাই। বিজ্ঞগণ

নির্দ্দেশ করেন, আত্মা লইয়াই এই সংসার গঠিত হইয়াছে। আত্মাকে না জানিলে, কিছুতেই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র আত্মাই এই দেহরূপ রাজ্যের অধীশ্বর। এই রাজ্যেশ্বরকেই বিশেষ ভাবে জানা উচিত। কারণ, তাঁহাকে জানিতে পারিলে অপর কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। যে মনুষ্য আত্মাকে জানে না, সে কোন কালেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট।

পশু-জাতির আত্মজ্ঞান নাই, এই কারণ বশতঃ বল বীর্য্য ও বিক্রম থাকা সত্বেও তাহারা চিরকাল মানব জাতির অধীন হইয়া আছে। জীবের শারীরিক বল—বলই নহে; আত্মবলই প্রকৃত বল। আত্মবলে স্বর্গ পর্য্যন্তও অনায়াসে জয় করা যাইতে পারে।

আমি এই—আমি নহি, আমার পুত্র এই—পুত্র নহে, আমার অপূর্ব্ব আরাম উদ্যান, অট্টালিকা, বিলাস ভবন, পুষ্করিণী, সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত বস্তু—বস্তু নহে। সংসারের কিছুই থাকিবে না। এই অপত্য, এই আত্মীয়, ইহারা কেহই আমার নহে; আর আমিও তাহাদের নহি। এমন কি, আমি আমার নিজেরও নহি। যদি আমি আমার নিজের হইতাম, তাহা হইলে যখন যাহা মনে করি, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে রোগ, শোক দুশ্চিন্তা, মানসিক কষ্ট আমাকে আর আক্রমণ বা অভিভূত করিতে সমর্থ হইত না। এই সকল বিচার বুদ্ধিলাভই আত্মতত্ত্ব বিচারণার ফল।

যে সুধীর ব্যক্তি নিরন্তর আত্মতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করেন, অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তিনি সামান্য বিপদে অভিভূত, অথবা সামান্য সম্পদে কখনই মত্ত হন না। তাঁহার নিকট লোষ্ট্র-কাঞ্চন, হর্ষ-বিষাদ এবং সুখ-দুঃখ একই প্রকার প্রতীয়মান হয়। তিনি কিছুতেই অবশ, অবসন্ন ও বিচলিত হন না। শত শত গ্রামের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, যেমন তাঁহার কোন প্রকার বিকার সঞ্চার হয় না; সর্ব্বদিকে শতরূপ অনিষ্টাপত্তি হইলেও, অবিকৃত ভাবে অবস্থিত করেন। ইহারই নাম আত্মবল।

স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্র অপেক্ষা প্রভু ও পরাক্রমী দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সামান্য ফলমূলাশী অরণ্যবাসী একজন ঋষিও কুলিশ সহিত তদীয় হস্ত

অনায়াসে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ ইন্দ্রের আত্মবল নাই। উক্ত ঋষির বলই, আত্মবলের পরীক্ষা ও লক্ষণ।

---

# দ্বাদশ-নীতি।

( শ্রীমতী নির্ম্মলিনী চৌধুরাণী, কোন্নগর )।

( ১ )

অলসের শিল্প কোথায়? শিল্পহীনের ধন কোথায়? নির্ধনের মিত্র কোথায়? মিত্র বিহীনের সুখ কোথায়? অসুখীর পুণ্য কোথায়? পুণ্য-হীনের নির্ব্বাণ কোথায়?

( ২ )

শিল্পের ( পালি ভাষায় বিদ্যাকে শিল্প বলা হইয়াছে ) সমান ধন নাই। শিল্পকে ( বিদ্যাকে ) চোরে কোন মতে চুরি করিতে, বা দস্যুতে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহলোকে শিল্পই পরম মিত্র, পরলোকেও সুখদায়ক।

( ৩ )

অল্প বলিয়া অবজ্ঞা করিতে নাই। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা হৃদয়ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখা উচিত। জলবিন্দু পতনের দ্বারা বল্মীক ( উইয়ের ঢিবি ) যেমন কালে পরিপূর্ণ হয়, অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চয়ের দ্বারাও কালে লোকে মহাজ্ঞানী হইতে পারে।

( ৪ )

যে কোন দ্রব্যই হউক না কেন, অল্প বা ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। একটী অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেও মানবের পরম উপকার হইতে দেখা যায়।

( ৫ )

যেখানে কোন শ্রুত সম্পন্ন ( মহাভিজ্ঞ ) পণ্ডিত আছেন, ইহা শুনিতে বা

জানিতে পারিলে বিদ্যাশিক্ষার্থীর পক্ষে মহোৎসাহে সেইস্থানে গমন করা কর্ত্তব্য।

( ৬ )

জলের গভীরতা অনুসারে ( কুমুদনল অর্থাৎ ) কুমুদ ফুলের নলের উচ্চতা; বংশমর্য্যাদা অনুসারে প্রথা স্থাপন; ব্যক্তি বুঝিয়া তাহার সহিত সেই মত বাক্য কথন এবং ভূমির উর্ব্বরতা হিসাবে তৃণের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

( ৭ )

সাগরের অগাধ জল না দেখিয়াই কূপ-মণ্ডুকেরা যেমন কূপের জলকেই অত্যধিক মনে করে, অল্প শ্রুত (অর্থাৎ সামান্য পণ্ডিত) অভিমানিগণও সেইরূপ নিজের যৎসামান্য জ্ঞানকে বহু বলিয়া মনে করে।

( ৮ )

প্রথম বয়সে, অর্থাৎ—বাল্যকালে যে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জ্জন করে নাই; দ্বিতীয়ে—অর্থাৎ যৌবন কালে যে লোক ধনার্জ্জন করে নাই; তৃতীয়ে—অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থায় যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে নাই, চতুর্থে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে—(মরণ কালে) সে কি করিবে?

( ৯ )

চুণ ব্যতিরেকে পানের, দরিদ্র ব্যক্তির অলঙ্কার পরিধানে, লবণ হীন ব্যঞ্জনের ও মূর্খের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কোন আস্বাদ নাই।

( ১০ )

রণক্ষেত্রে যাইতে হইলে, যোদ্ধার পক্ষে যেমন অস্ত্র ছাড়া যাওয়া উচিত নহে, বিদেশে যাইতে হইলে, পণ্ডিত, পর্য্যটক এবং বণিকের পক্ষে সম্বল ( টাকা কড়ি ) ছাড়া যাওয়া উচিত নহে।

( ১১ )

পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের অর্থনাশ, মনস্তাপ এবং গৃহের দোষকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। কোন স্থানে বঞ্চিত এবং অপমানিত হইলে, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।

( ১২ )

পাত্র বুঝিয়া যিনি বাক্য ব্যবহার করিতে জানেন, স্বভাব বুঝিয়া যিনি সখ্যতা স্থাপন করিতে জানেন এবং নিজের দোষ গুণ বুঝিয়া যিনি রাগ করিতে জানেন; তিনিই বিজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

---

# ছোট গল্প।

( কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী ঘোষ, কোন্নগর )।

( ১ )

## বিষম সমস্যা।

বেগুনবেড়ের চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ঠাকুর বাবুদের 'বার্ষিক' আদায় করিতে আসিয়াছিলেন। বার্ষিকের ধুতি, চাদর ও নগদ টাকাগুলি হস্তগত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার বাজার করিবার মানসে বাহির হইলেন। অধিক কিছু খরিদ করিতে হইবে না; তবে বাটীর জন্য এক আধখানা বস্ত্র, নাতি-নাতনিদের নিমিত্ত দুই একটা ছিটের জামা, ফ্রক্, জুতা ইত্যাদি না কিনিলেই নয়। আরও কিছু দ্রব্য—আলতা, মাথাঘসা, তেলের মসলা, চিরুণী-ফিতা ইত্যাদি—কিনিতে হইবে। লোকটা একে অজ-পাড়াগেঁয়ে, তাতে আবার টোলের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, যত চালাক চতুর তা সহজেই বোঝা যায়, বোকার এক শেষ! তিনি আর কাপড়ের দোকান কোথায়ও খুঁজিয়া পান না, বড়ই মুস্কিলে ও বিভ্রাটে পড়িলেন। অনেক ঘুরিয়া অবশেষে একটা বিষম চালক স্কুলের ছোঁড়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে মহাব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা

করায় সে উত্তর দিল—"ঠাকুর মশাই! সমুখের এই বড় রাস্তায় পড়িয়া দু'ধারে সাইনবোর্ড দেখিতে দেখিতে চলিয়া যান।"—সাইন-বোর্ড কি, তাহা ব্রাহ্মণ বুঝিতে না পারায় বালকটি তাহাকে উহা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিল। সাইনবোর্ড কাহাকে বলে ব্রাহ্মণ তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বড় রাস্তায় আসিলেন এবং উর্দ্ধমুখে সাইনবোর্ড দেখিয়া গমন করিতে করিতে কলিকাতার জনতাবহুল পথে কত যে হুচোট্ খাইলেন, কত ইতর ভদ্রের পায়ের উপর পড়িলেন, কত ট্যাস্ ফিরিঙ্গীর বাঁকা কথা ও গালি সহ্য করিলেন, গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইলেন, তাহা বলবার নয়। এই প্রকারে অনেক পথ অগ্রসর হইয়া একখানা খুব বড় সাইনবোর্ড দেখিয়া ভট্চাজ্ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উক্ত সাইনবোর্ডে লেখা ছিল;—

**দেশী চিনি ও মিছরির কারখানা।** ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিলেন—

**দেশীচি নিওমি ছরিরকা রখানা।**

বস্ত্রাদি খরিদ করা ভট্টচার্য্যের মাথায় উঠিল! তিনি তাড়াতাড়ি এক শিষ্যের বাড়ী হাজির হইলেন, কেবলই সাইনবোর্ড লিখিত কথাগুলির অর্থ ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই উহার কুটিল ও দুর্ব্বোধ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে স্থির করিলেন, দেশে গিয়া তর্ক-দশানন খুড়াকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা যাইবে, খুড়া না জানে এমন বিষয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও জানেন না: এই জন্য খুড়োকে দশগাঁয়ের লোক তর্ক-দশানন বলে। খুড়া যে নিশ্চয়ই ইহার উচিত অর্থ করিয়া দিবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। ঘুমের ঘোরে সারারাত্রি আবৃত্তি করিলেন:—**দেশীচি নিওমি ছরিরকা রখানা।**

(২)

## এক দশা।

মদনমোহন বাবু রমানাথ কামার নামক এক জনের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইল—কিন্তু ঋণ

শোধ দিবার নামটিও নাই দেখিয়া রমানাথ তাগাদায় বাহির হইল। প্রাতঃকালে মদন বাবু রোয়াকে বসিয়া মুখ ধুইতেছেন, এমন সময় পাওনাদার টাকা চাহিতে আসিল। রমানাথকে দেখিয়া মদন বাবু যেন একটু লজ্জিত হইলেন; কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"বাপুহে! তুমি কি কাহারও কিছু ধার?" পাওনাদার কহিল—"না।"

মদনবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তবে আর তোমার এত তাগাদা কেন? সহজেই তো তুমি আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিতে পার।" পাওনাদার বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া—"যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

ক্রমে পূজা আসিয়া পড়িল। এ সময়ে সকলকেই যথাসাধ্য বাজার করিতে হইবে। সুতরাং সকলেরই অর্থের প্রয়োজন। পাওনাদার রমানাথ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আবার আসিয়া মদনমোহন বাবুর বাটীতে হাজির হইল। বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—"বাবু, আমি এসেছি।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বাপু! এবার তোমার খবর কি? তুমি কাহারও কিছু ধার নাকি?" পাওনাদার মৃদুভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছি।" বাবু কহিলেন—"তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করনা কেন?" রমানাথ মৃদুস্বরে বলিল—"হাতে টাকা নাই বলিয়া।" মদন বাবু সহাস্যে কহিলেন,—"বটে? তোমার ও আমার দশা এক! এখন তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ, আর তাগাদা করিও না। এস ভাই, দুইজনে কোলাকুলি করি।"

পাওনাদার অবাক!!

অগ্রজ

দেবেন্দ্রমোহন গুপ্তের অকাল মৃত্যুতে

# শোকোচ্ছ্বাস।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংখ্যরত্ন)। *

কেবা তুমি ছায়া সম ধরি কলেবর,
নিয়ত সঙ্গেতে মোর করিছ ভ্রমণ?
চলিতে চলিতে আমি কার পদধ্বনি শুনি,
চকিতে চাহিয়ে থাকি নিশ্চলের মত?
কার স্পর্শ অঙ্গে যেন হয় অনুভব,
কে তুমি স্বপনে আসি নির্নিমেষে চেয়ে রও?
সে দৃষ্টি করুণামাখা সে বদন স্নেহে ভরা,
সে অঙ্গে স্বরূপ-জ্যোতিঃ কিবা চমৎকার!
প্রতি কার্য্যে কার সাড়া কার সাবধানে,
অবাক্ হইয়ে আমি চাহি ঊর্দ্ধ পানে।
আলোড়ি হৃদয়রাজ্য একটি দীরঘ শ্বাস,
কাহার উদ্দেশে ধায় কাঁপাইয়া বায়ুস্তর?
কি যেন বলিতে আসা কিন্তু বলা নাহি হয়—
ইহলোকে পরলোকে বুঝি ব্যবধান রয়!
সত্য কেবা বল তুমি দেখা দাও দিবালোকে,
আজ্ঞা তব নত শিরে পালিব জীবন দানে।

---

* বিগত ৬ই পৌষ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় "প্রতিভা"র চিন্তাশীল লেখক ৺ দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৪শে পৌষ অপরাহ্নে স্থানীয় থিয়েটার-হলে, "ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতির" উদ্যোগে একটী শোক সভা আহুত হয়। ফরিদপুরস্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন মহাশয়, পরলোক গত মহাত্মার মধ্যম ভ্রাতা। শোক সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমরা দুইটী সন্নিবেশিত করিলাম। সম্পাদক।

অহো।

আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়,
অশরীরি তুমি দেব অগ্রজ আমার,—
চিনেছি তোমারে আমি, পার নি ভুলিতে মোরে,
ছায়া সম তাই বুঝি রয়েছ সঙ্গেতে?
দাঁড়াও দাঁড়াও দেব! পরলোক-বেলাভূমে,
ইহলোক পরলোকে সম্বন্ধ স্থাপিত হোক,—
মৃত্যুর নিবিড় ধূম ভেদ করি দৃষ্টি মোর
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তব দেখিবে পুলকে।

অম্বরের মাঝে বসি আমারে আশীষ কর,
রূপ-তৃষ্ণা চির তরে যাউক ঘুচিয়ে—
হৃদয় পবিত্র হোক, মন প্রশান্ত হোক,
তৃষ্ণাশূন্য ক'রে দাও জ্বলিত সংসারে।
অদ্ভুত এ কর্ম্মযোগ শিখা'তে আমারে,
বুঝি লোকান্তর গতি তব। হের ঊর্দ্ধেতে অনন্ত
আকাশ বিস্তৃত, গর্জ্জিছে জীমূত তায়,—
খসিছে তারকা, ভীম উল্কাপাত, দৃষ্টি নাহি চলে
ভীষণ আঁধারে।

নিম্নেতে অপার অসীম সমুদ্র
উর্ম্মি'পর উর্ম্মি পড়িছে আছাড়ি;—
ছুটিছে তরঙ্গ—ভাঙ্গিতেছে বেলা,
নক্র আসে ধেয়ে গ্রাসিতে আমারে।
ভীষণ দুর্য্যোগ ঊর্দ্ধে নিম্নে, মোর
মধ্যেতে আসন পাতা। যদি হৃদি কাঁপে
এ ঘোর শ্মশানে, নিমিষে হইব নাশ;—
দানবীয় শক্তি নিক্ষেপিবে দূরে
আসন হইব ভ্রষ্ট। কি হবে তখন
কি হবে দেবতা! কে রক্ষিবে ভৃত্যে তব!

ভীরু আমি কর আশীর্ব্বাদ—
বল সেই স্নেহ-স্বরে—"মাভৈঃ মাভৈঃ ভ্রাতঃ,
'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'
'যদা সংহরতে চায়ং কুর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ'।"
অনুজ তোমার এ কাল শ্মশানে—
উন্মত্তের মত হাহাকার করে।
উঠ উঠ দেব! চিতা-শয্যা ছাড়ি,
প্রবোধের বাণী শুনাও তাহারে।
অসহ্য সংসার-জ্বালা যদি বল দেব!—
কেমনে এ দাস তাহা সহিবে নীরবে?
কর আশীর্ব্বাদ, মাগি ভিক্ষা করযোড়ে;
তব পরিত্যক্ত কর্ম্মের পশরা বহিতে
সক্ষম যেন হই এ জীবনে।
হৃদয় পাষাণ হোক, বজ্রে যেন নাহি ভাঙ্গে,
ইন্দ্রিয় প্রশান্ত হোক ইন্দ্রিয়ার্থে নাহি মজে,
অনন্তের পক্ষপুটে ক্ষুদ্রত্ব ডুবিয়ে যাক
নিষ্কম্পিত বীর ভাবে।
সহস্রের মাঝখানে আমারে
ডুবিয়ে দাও, অনাহত রবে দেব!
আমারে শুনাও আজ,—
"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ"
"অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতং
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতিনিশ্চিত্য শাম্যতি"—
সে মহা ত্যাগের বাণী শুনাও আবার,—
"অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু মা যাতি তোষং প্রসভং ব্রবীমি"।
বল বল, আমি শুনিব নীরবে—
"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি।"

বল দেব উৰ্দ্ধলোক হ'তে
পুরাতন তব সেই দৃঢ় বাণী ;
যা শুনি আমি হ'ব বলীয়ান্,
শত প্রলোভন করিব জয়।
বল সেই শক্তিমন্ত্র শুনি নত শিরে,—
"সাধনা কি রে কাপুরুষে পারে ?
হ'তে হবে মহাবীর। ধরি রুদ্র রূপ
হও অগ্রসর ত্রিশূল লইয়ে করে ;
বিঘ্নরূপে যারা আসিবে সম্মুখে
নির্ম্মমের মত নাশিবি হেলায়।"
বুঝিয়াছি আমি সৌম্যের সাধনা—
হ'বে না হ'বে না আর, এস রুদ্রদেব !
পূজিব তোমারে ;—নিতে হৃদি রক্ত
এ ঘোর মশানে, নৃমুণ্ডমালিনী কালী
এস মা নাচিয়ে।
কি ভয় আমারে দেখাবি সংসার,
আমি যে রে বীবানুজ ! অগ্রজ আমারে
গিয়াছেন ফেলে। না—না—ভুল মোর,
দেবতা আমার দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
অশরীরী রূপে রক্ষিছে আমারে ;—পরাতে
শৃঙ্খল এসেছিস্ কে রে পদে—
পাবি না স্থান।
নিশ্চয় দলিব—দেখিবি বিস্ময়ে—
কি শক্তি হৃদয়ে মোর ছিল আচ্ছাদিত।
পবিত্র শ্মশানে লইয়াছি দীক্ষা,
গুরু মোর দেবেন্দ্র বাসব ;—
বজ্রীর শকতি হৃদয়ে আজি রে ;
নিশ্চয় করিব জয়—

এস দেব ! এস দেব !
এস ভ্রাতৃ রূপী মহাগুরু !
ছায়াময় দেহে দাড়াও সম্মুখে,
ঊর্দ্ধ করি ভুজ যুগ ;—
অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাও আমারে,
আমার কর্ত্তব্য পথ, তব তুষ্টি সাধি
কোন্ পথে আমি আসিব ছুটিয়ে কাছে,
অধমের পূজা কি ভাবে লইবে,
কিবা হবে উপচার ?
দাও উপদেশ, করো না বিলম্ব
পূজা অন্তে পাব তোমা—
উৎসর্গিব হৃদি, উৎসর্গিব প্রাণ,
যাতে তব হবে তুষ্টি ;—পূজা শেষে
তুমি আসিও সম্মুখে, ডাকিও
দু'হাত তুলি, আমি পরম আনন্দে
মুদিব নয়ন—মিলনের আশা লয়ে ।
পতিত মমতা-বর্ত্মে আমি যে নিতান্ত,
সে মোহ ভাঙ্গিতে কিহে তব এ প্রয়াস ?
অগ্রেতে আমার গিয়েছ অগ্রজ, অনুজে
দেখাতে পথ ?
আমি মুছিয়াছি চক্ষু—নাহি অশ্রুজল,
ভাঙ্গিয়াছে ভুল দেখিয়াছি আলো,—
ও আলোক কত উর্দ্ধে, কোন অজানিত স্থানে
ধ্যেয়, জ্ঞেয়, সব লয় ও আলোর মধ্য দেশে ।
ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি অনিমেষে চেয়ে থেকো,
নতুবা সেবক তব পাড়বে ভূতলে ! হবে না
সাধনা তব, অস্থিচূর্ণ হবে, বড় ভয়—
তাই ডাকি রক্ষা কর মোরে ।
একি জ্যোতি গগণ ভেদিয়া

অকস্মাৎ সম্মুখে আমার
সচন্দ্র তারকা কোথা লুকাইল ?
শুধু এক ধ্বনি, শুধু এক তান ;—
তোমাতে বহুর লয়, বহু তব অঙ্গে।
অনন্ত অনন্ত, এ যে আলোক অনন্ত,
নাহি স্থান, নাহি কাল, না আছে বিরাম,
সহস্র কার্য্যের মাঝে আমার অজ্ঞাতসারে
আমার হৃদয়-রাজ্য গেল রে ভরিয়ে ?
উদাস হইল মোর ইন্দ্রিয় সকল,
জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, সাধক সাধনা নাই,
তবু চিত্ত কোন্ বলে রহিলি নিশ্চল ?
অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব !—এ যে বড়ই অদ্ভুত !
ইন্দ্রিয়ার্থ ছুটে আসে, ইন্দ্রিয় না চাহে
তারে ; স্বভাবের প্রত্যাহারে চিত্ত
আত্ম মুখী হয় ;—বিয়োগিত ভূমে
একি যোগের উদয় ?
কে যেন জগত বার্ত্তা দিলরে ভুলায়ে
জগতের বক্ষপরে বসায়ে আমারে ;—
এ বিস্মৃতি কেবা মোর দিল রে আনিয়ে ?
অহো !
বিয়োগেও আছে শান্তি আঁধারেও
আছে আলো ;—ভীষণ ঝটিকা
অন্তে প্রশান্ত প্রকৃতি মত।
কে তুমি ! আমারে লয়ে,
খেলিতেছ এই খেলা ?
এত যদি দয়া তব আশীর্ব্বাদ কর,
এ আলোকে কভু যেন ফেলি না নিবায়ে।
এতদূরে এতদূরে—"কঃ পন্থা"র

পথ তব ;—দেখাও—দেখিব আমি
এ পথ মহান্।
না-না, দেব! এ নহে সময়,—
সাধনা বিহীন এ দাস ;
আমিও অন্তিমে রব প্রতীক্ষায়,—
সাধন সুদৃঢ় চিত্তে।
আমায় নিও হাত ধরে—দিও পদছায়া,
পরলোক বেলা-ভূমে ;—অঙ্কেতে
প্রদানি তোমার মঙ্গল কর,
সংসারের শ্রান্তি মোর দিও মুছাইয়ে।
যেখানে দেবত্ব তব তথা নিয়ে যেও,
জীবত্ব তোমার দেব! নাহি মাগি আর।
শ্রান্ত তোমারে আমি চাহি না দেখিতে,
যে রূপে প্রশান্ত তুমি দেখিব পুলকে।
সে মহা প্রয়ান কতদূরে দেব?
কতদূরে সেই যাত্রা?—
অধীর হৃদয়, আকুল পরাণ ;
বল বল অধমেরে।

---

# স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত *

( শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা )।

যে অমৃতময়ী লেখনীর গুরুগম্ভীর নিনাদে কতিপয় মাস যাবত "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল, তাহা এত দিনে নীরব হইল!

* শোক সভায় পঠিত।

"কঃ পন্থা"র ভাব ও ভাষা যে চিন্তাশীল লেখকের অমৃত বাণী ব্যক্ত করিয়াছে, যাহার—"জীবন কি অনুভূতি ?"—মানবের জীবন কাহিনী সম্যক্ পরিস্ফুট করিয়াছে, যে—'গৃহদাহে"—জাতীয় গৃহের রুদ্ধ কর্ম্মদ্বার সবলে উদ্ঘাটিত হয়,—"আগমনী"র—যে ললিত ঝঙ্কারে মানবকে নারীপূজা ব্রতে স্বতঃই নিয়-ন্ত্রিত করে, তাহাদের লেখক নীরব !—গত ৬ই পৌষ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় 'প্রতিভা'র চিন্তাশীল লেখক ও স্থানীয় উকিল ৺দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা দ্বয়, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, পুত্র-কন্যা ও স্বজনবর্গ এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবগণের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

দেবেন্দ্রমোহনের জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত ; মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমরা বাল্য কালে সহপাঠী ছিলাম, উভয়েই সমবয়স্ক। গত ২৪ বৎসর কাল, দেবেন্দ্রমোহন আমায় যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের স্বাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না,—হইতেই চাহি না।

অল্প বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেও, তাঁহার আদর্শপূর্ণ সংক্ষিপ্ত জীব-নীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অমন কর্ত্তব্য-পরায়ন, অমন ধীর,—এত ধর্ম্মানুরক্ত ও আত্মনির্ভরশীল একটী প্রাণ আজকাল বড়ই বিরল। যখন ২৪ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর একটী বালক স্থানীয় জিলা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম আইসে,—তখন কে জানিত এই বালক এত অল্প সময়ের মধ্যেই ফরিদপুর-বাসীর মন হরণ করিয়া লইবে ?—আজ ফরিদপুরের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমগ্র লোক যে মহাত্মার শোকে মুহ্যমান, তাহাদিগের প্রাণ আর কে নব আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিবে ? যে নবযুগের নব সুরে আজ সমগ্র দেশ স্পন্দিত, সে স্পন্দনে কে আর সুর-তান-লয়ের সমাবেশ করিবে ? কর্ম্মের যে নব-মধুর স্বাদে কর্ম্মী আজ আশান্বিত হইয়া প্রবল উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল,—তাহাকে কে আর গম্ভীর কণ্ঠে বলিবে—

"হে আমার দেশবাসিগণ ! বহুদিন নিদ্রা গিয়াছ, আর নহে। গৃহে আগুন লাগিয়াছে, নয়ন উন্মীলিত কর ভাই !—'জাগৃহি !—জাগৃহি !'—নব

জাগরণে একবার কর্ম্মের ভেরী বাজাও,—তোমাদের গম্ভীর নিনাদে—বিলাসিতা, আলস্য এবং আভিজাত্যের হীন গৌরব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ুক।*

তিনি বড় অমায়িক ছিলেন। সকলের সঙ্গেই মিশিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র কতিপয় বন্ধু ব্যতীত অপরের সহিত বেশী মাখামাখি ছিল না। স্থানীয় স্কুলে অধ্যয়ন সময়ে, ৪ বৎসর আমরা সহপাঠী ছিলাম। তাঁহার মধুর স্বভাবে স্কুলের বহুসংখ্যক ছাত্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার পর এফ, এ, পাঠকালে যদিও আমরা দুই জনে কলিকাতায় পড়িতাম কিন্তু অনেক সময়েই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত না; কারণ আমাদের বিভিন্ন কলেজ ও বাসস্থান ছিল। বি, এ, অধ্যয়ন কালে, এক বৎসর আমরা একটী 'মেসেই' অবস্থান করি। তারপর কিছুকাল ছাড়াছাড়ির পর, গত কয়েক বৎসর প্রায়ই দেখা হইত। আমি গত বৎসর পূজার সময়, যখন এখানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস আরম্ভ করি, সেই সময় হইতে দেবেন্দ্রমোহনের সহিত আমার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত। গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি 'প্রতিভা'র লেখক হইলেন; এই ৮ মাস কাল তিনি প্রত্যহ আমাদের বাসায় বহু সময় যাপন করিতেন, কোন কোনও দিন ৫। ৬ ঘণ্টাও থাকিতেন।

( ক্রমশঃ )

# বিবিধ।

## ( সম্পাদক )।

### ( ক ) উপনয়ন :—

১। বিগত ১২ই পৌষ বাইশরশী (ফরিদপুর) গ্রামে, ডাঙ্গা "আর্য্য-কায়স্থ সভা ও প্রচার সমিতির"সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়নের ক্ষেত্রে বাইশরশি ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রায় ২৫ জন কায়স্থ মহোদয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষাত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা মজুমদার

* "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" ৫ম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। লেখক

মহাশয় আচার্য্য এবং ইদিলপুর শিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ এবং প্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যথাক্রমে তন্ত্রধারকাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কেন্দ্রে সম্পাদনার্থে কায়স্থ-সভার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় এবং যোগেশ বাবুকে আমরা আন্তরীক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) অন্যান্য :—

১। ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বিরাট উৎসব।—বিগত ১৬শে কার্ত্তিক শুক্ল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে কলিকাতা-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে, কায়স্থ আদি-পিতা, ভগবান ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের যথা বিধি পূজা যোড়শোপচারে সম্পন্ন হইয়াছে; এতদুপলক্ষে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই দিবস বঙ্গের নানাস্থানে কায়স্থ আদি-পিতার পূজা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নির্ব্বাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—

(ক) ফরিদপুর জিলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে।

(খ) দিনাজপুর রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহোদয়ের উদ্যোগে।

(গ) পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে।

আমরা আশা করি, এই পিতৃপূজা গৌড় বঙ্গের প্রতি কায়স্থ গৃহে ক্রমে ক্রমে অনুসৃত হইয়া কায়স্থের জাতীয় স্মৃতি পুনর্জ্জাগরিত হইবে।

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য** :—ছাপাখানার কর্ম্মচারীগণ ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকা বিলম্বে প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য আমরা গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থী করিতেছি।

সহঃ সম্পাদক।

---

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।